গল্পকল্প

পরশুরাম

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ—১৩৫৭

মুদ্রাকর : শ্রীসাধনকুমার গুপ্ত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিণ্টিং
২১/বি, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৬

সূচী

গামানুষ জাতির কথা

যে সময়ের কথা বলছি তার প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে পৃথিবী থেকে মানবজাতি লুপ্ত হয়ে গেছে। তর্ক উঠতে পারে, আমরা সকলেই যখন পঞ্চত্ব পেয়েছি তখন এই গল্প লিখছে কে, পড়ছেই বা কে। দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। লেখক আর পাঠকরা দেশ-কালের অতীত, তাঁরা ত্রিলোকদর্শী ত্রিকালজ্ঞ। এখন যা হয়েছিল শুনুন।

বড় বড় রাষ্ট্রের যাঁরা প্রভু তাঁদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেক দিন থেকেই চলছিল। ক্রমশঃ তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মিটমাটের আর আশা রইল না। সকলেই নিজের নিজের ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানটি ন্যাশনাল অ্যানথেম রূপে গাইতে লাগলেন—'আমরা ইরান দেশের কাজী, যে বেটা বলিবে তা না না না সে বেটা বড়ই পাজী।' অবশেষে যখন কর্তারা স্বপক্ষের জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে নিঃসন্দেহ হলেন যে বজ্জাত বিপক্ষ গোষ্ঠীকে একেবারে নির্মূল করতে না পারলে বেঁচে সুখ নেই তখন তাঁরা পরস্পরের প্রতি অ্যানাইহিলিয়ম বোমা ছাড়লেন। বিজ্ঞানের এই নবতম অবদানের তুলনায় সেকেলে ইউরেনিয়ন বোমা তুলো-ভরা বালিশ মাত্র।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের বোমা-বিশারদগণ আশা করেছিলেন যে অপরাপর পক্ষের যোগাড় শেষ হবার আগেই তাঁরা কাজ

সাবাড় করবেন। কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সকলেরই আয়োজন শেষ হয়েছিল এবং তাঁরা গুপ্তচরের মারফত পরস্পরের মতলব টের পেয়ে একই দিনে একই শুভলগ্নে ব্রহ্মাস্ত্র মোচন করলেন।

সভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য কোনও দেশ নিস্তার পেলে না। সমগ্র মানবজাতি, তার সমস্ত কীর্তি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গাছপালা, মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হল। কিন্তু প্রাণ বড় কঠিন পদার্থ, তার জের মেটে না। সাগরগর্ভে পর্বতকন্দরে জনহীন দ্বীপে এবং অন্যান্য কয়েকটি দুষ্প্রবেশ্য স্থানে কিছু উদ্ভিদ্ আর ইতর প্রাণী বেঁচে রইল। তাদের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের দরকার নেই, যাদের নিয়ে এই ইতিহাস তাদের কথাই বলছি।

লণ্ডন প্যারিস নিউইয়র্ক পিকিং কলকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে রাস্তার নীচে যে গভীর ড্রেন ছিল তাতে লক্ষ লক্ষ ইঁদুর বাস করত। তাদের বেশীর ভাগই বোমার তেজে বিলীন হল কিন্তু কতকগুলি তরুণ আর তরুণী ইঁদুর দৈবক্রমে বেঁচে গেল। শুধু বাঁচা নয়, বোমা থেকে নির্গত গামা-রশ্মির প্রভাবে তাদের জাতিগত লক্ষণের আশ্চর্য পরিবর্তন হল, জীববিজ্ঞানীরা যাকে বলে মিউটেশন। কয়েক পুরুষের মধ্যেই তাদের লোম আর ল্যাজ খসে গেল, সামনের দুই পা হাতের মতন হল, পিছনের পা এত মজবুত হল যে তারা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে আর চলতে শিখল, মস্তিষ্ক মস্ত হল, কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কিচকিচ ধ্বনির পরিবর্তে সুস্পষ্ট ভাষা ফুটে উঠল, এক কথায় তারা মানুষের সমস্ত লক্ষণ পেলে। কর্ণ যেমন সূর্যের বরে

সহজাত কুণ্ডল আর কবচ নিয়ে জন্মেছিলেন, এরা তেমনি গামা-রশ্মির প্রভাবে সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে আবির্ভূত হল। এক বিষয়ে ইঁদুর জাতি আগে থেকেই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল—তাদের বংশ-বৃদ্ধি অতি দ্রুত। এখন এই শক্তি আরও বেড়ে গেল।

এই নবাগত অলাঙ্গুল দ্বিপাদচারী প্রতিভাবান প্রাণীদের ইঁদুর বলে অপমান করতে চাই না, তা ছাড়া বার বার চন্দ্রবিন্দু দিলে ছাপাখানার উপর জুলুম হবে। এদের মানুষ বলেই গণ্য করা উচিত মনে করি। আমাদের মতন প্রাচীন মানুষের সঙ্গে প্রভেদ বোঝবার জন্য এই গামা-রশ্মির বরপুত্রগণকে 'গামানুষ' বলব।

এখন কিঞ্চিৎ জটিল তত্ত্বের অবতারণা করতে হচ্ছে। যাঁরা ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা মোটামুটি পঁচিশ বৎসরে মানুষের এক পুরুষ এই হিসাবে বংশপর্যায় গণনা করেন। অতএব ১৮০০০ বৎসরে ৭২০ পুরুষ। আমাদের ঊর্ধ্বতন ৭২০ নম্বর পুরুষ কেমন ছিলেন? নৃবিদ্যাবিশারদগণ বলেন, এঁরা পুরোপলীয় অর্থাৎ প্রাচীন উপল যুগের লোক, চাষ করতে শেখেন নি, কাপড় পরতেন না, রাঁধতেন না, কাঁচা মাংস খেতেন, গুহায় বাস করতেন। ভেবে দেখুন, মোটে ৭২০ পুরুষে আমাদের কি আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। আমাদের যেমন পঁচিশ বৎসরে, ইন্দুরোদ্ভব গামানুষদের তেমনি পনের দিনে এক পুরুষ, কারণ তারা জন্মাবার পনর

দিন পরেই বংশরক্ষা করতে পারে। মানবজাতি ধ্বংস হবার পর যে ত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে সেই সময়ে গামানুষ জাতির ৭২০ পুরুষ জন্মেছে। অর্থাৎ গামানুষের ত্রিশ বৎসর আমাদের ১৮০০০ বৎসরের সমান। যদি সন্দেহ থাকে তবে অঙ্ক কষে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে গামানুষ অতি দ্রুত গতিতে সভ্যতার শীর্ষদেশে উপস্থিত হয়েছে। পূর্বমানব যে বিদ্যা কলা আর ঐশ্বর্যের অহংকার করত গামানুষ তার সমস্তই পেয়েছে। অবশ্য তাদের সকল শাখাই সমান সভ্য আর পরাক্রান্ত হয় নি, তাদের মধ্যেও জাতিভেদ, সাদা-কালার ভেদ, রাজনীতির ভেদ, ছোট বড় রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য, পরাধীন প্রজা, দ্বেষ-হিংসা এবং বাণিজ্যিক প্রতিযোগ আছে, যুদ্ধবিগ্রহও বিস্তর ঘটেছে। বার বার মারাত্মক সংঘর্ষের পর বিভিন্ন দেশের দূরদর্শী গামানুষদের মাথায় এই সুবুদ্ধি এল—ঝগড়ার দরকার কি, আমরা সকলে একমত হয়ে কি শান্তিতে থাকতে পারি না? আমাদের বর্তমান সভ্যতার তুলনা নেই, আমরা বিশ্বের বহু রহস্য ভেদ করছি, প্রচণ্ড প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করে কাজে লাগিয়েছি, শারীরিক ও সামাজিক বহু ব্যাধির উচ্ছেদ করেছি, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেছি। আমাদের রাষ্ট্রনেতা ও মহা মহা জ্ঞানীরা যদি একযোগে চেষ্টা করেন তবে বিভিন্ন জাতির স্বার্থবুদ্ধির সমন্বয় অবশ্যই হবে।

জনহিতৈষী পণ্ডিতগণের নির্বন্ধে রাষ্ট্রপতিগণ এক মহতী

বিশ্বসভা আহ্বান করলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় রাজ-নীতিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক প্রভৃতি মহা উৎসাহে সেই সভায় উপস্থিত হলেন, অনেক রবাহূত ব্যক্তিও তামাশা দেখতে এলেন। যাঁরা বক্তৃতা দিলেন তাঁদের আসল নাম যদি গামানুষ ভাষায় ব্যক্ত করি তবে পাঠকদের অসুবিধা হতে পারে, সেজন্য কৃত্রিম নাম দিচ্ছি যা শুনতে ভাল এবং অনায়াসে উচ্চারণ করা যায়।

আমাদের দেশে হরেক রকম সভায় কার্যারম্ভের আগে সংগীতের এবং কার্যাবলীর মধ্যে মধ্যে কুমারী অমুক অমুকের নৃত্যের দস্তুর আছে। পরাক্রান্ত গামানুষ জাতির রসবোধ কম, তারা বলে, আগে ষোল আনা কাজ তার পর ফুর্তি। তাদের জীবনকালও কম সেজন্য বক্তৃতাদি অতি সংক্ষেপে চটপট শেষ করে। প্রথমেই সভাপতি মনস্বী চং লিং সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে এই সভায় যে কোনও উপায়ে বিশ্বশান্তির ব্যবস্থা করতেই হবে, নতুবা গামানুষ জাতির নিস্তার নেই।

সভাপতির অভিভাষণের পর একটি অনতিসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কাউণ্ট নটেনফ বললেন, জগতের সম্পদ মোটেই ন্যায়সম্মত পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় নি সেই কারণেই বিশ্বশান্তি হচ্ছে না। দু-চারটি রাষ্ট্র অসৎ উপায়ে বড় বড় সাম্রাজ্য লাভ করে দেদার কাঁচা মাল আর আজ্ঞাবহ নিস্তেজ প্রজা হস্তগত করেছে, উপনিবেশও বিস্তর পেয়েছে। কিন্তু আমরা বঞ্চিত

হয়েছি, আমাদের বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না। যদি যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হয় তবে বিশ্বসম্পত্তির আধাআধি বখরা আমাদের দিতে হবে।

বৃহত্তম সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি লর্ড গ্র্যাবার্থ বললেন, জগতের শান্তিরক্ষার জন্যই আমাদের জিম্মায় বিশাল সাম্রাজ্য থাকা প্রয়োজন, সাম্রাজ্য চালনার অভিজ্ঞতা আমাদের যত আছে তেমন আর কারও নেই। আমরা শক্তিমান হলে তোমরা সকলেই নিরাপদে থাকবে। কাঁচা মাল চাও তো উপযুক্ত শর্তে কিছু দিতে পারি। আমাদের হেফাজতে যে সব অসভ্য আর অর্ধসভ্য দেশ আছে তার উপর লোভ করো না, আমরা তো সেসব দেশবাসীর অছি মাত্র, তারা লায়েক হলেই ছেড়ে দিয়ে ভারমুক্ত হব। আমরা কারও অনিষ্ট করি না, বিপদ যদি ঘটে তবে আমার বন্ধু কীপফ-এর প্রকাণ্ড দেশই তার জন্য দায়ী হবে। এঁর দেশে স্বাধীন শিল্প আর কারবার নেই, সবই রাষ্ট্রের অঙ্গ। যাঁরা সমাজের মস্তকস্বরূপ সেই অভিজাত আর ধনিক শ্রেণীই ওখানে নেই। এঁদের কুদৃষ্টান্তে আমাদের শ্রমজীবীরা বিগড়ে যাচ্ছে। দিনকতক পরেই দেখতে পাবেন এঁদের কদর্য নীতি আর সস্তা মালে জগৎ ছেয়ে যাবে, আমাদের সকলেরই সমাজ ধর্ম আর ব্যবসার সর্বনাশ হবে। যদি শান্তি চান তো আগে এঁদের শায়েস্তা করুন।

জেনারেল কীপফ তাঁর মোটা গোঁফ পাক দিয়ে বললেন, বন্ধুবর লর্ড গ্র্যাবার্থ প্রচণ্ড মিছে কথা বলেছেন তা আপনারা সকলেই বোঝেন। ওঁর রাষ্ট্রই আমাদের সকলকে দাবিয়ে

রেখেছে, ওঁরা ঘুষ দিয়ে আমাদের দেশে বার বার বিপ্লব আনবার চেষ্টা করেছেন। এর শোধ একদিন তুলব, এখন বেশী কিছু বলতে চাই না।

পরাধীন দেশের জননেতা অবলদাসজী বললেন, লর্ড গ্র্যাবার্থ যে অছিগিরির দোহাই দিলেন তা নিছক ভণ্ডামি। আমরা লায়েক কি নালায়েক তার বিচারের ভার যদি ওঁরা নিজের হাতে রাখেন তবে কোনও কালেই আমাদের দাসত্ব ঘুচবে না। এই সভার একমাত্র কর্তব্য—সমস্ত সাম্রাজ্যের লোপ সাধন এবং সর্ব জাতির স্বাধীনতা স্বীকার। অধীন দেশই দ্বেষ-হিংসার কারণ।

মহাতপস্বী নিশ্চিন্ত মহারাজ চোখ বুজে বসে ছিলেন। এখন মৌন ভঙ্গ করে অবলদাসের পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, কোনও চিন্তা নেই বৎস, আমি আছি। আমার তপস্যার প্রভাবে তোমরা সকলেই যথাকালে শ্রেয়োলাভ করবে। গৌরীশংকর-শিখরবাসী মহর্ষিদের সঙ্গে আমার হরদম চিন্তাবিনিময় হয়, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত।

কর্মযোগী ধর্মদাসজী বললেন, এসব বাজে কথায় কিছুই হবে না। আগে সকলের চরিত্র শোধন করতে হবে তবে রাষ্ট্রীয় সদ্‌বুদ্ধি আসবে। আমার ব্যবস্থা অতি সোজা—সকলে নিরামিষ খাও, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জন কর, এক মাস [মানুষের হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর] নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য পালন কর, এই সময়ের মধ্যে বুড়োরা আপনিই মরে যাবে, নূতন প্রজাও জন্মাবে না, তার ফলে জগতের জনসংখ্যা অর্ধেক হয়ে

যাবে, খাদ্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব থাকবে না। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মহামারী কিছুই দরকার হবে না, বিশুদ্ধ ধর্মসঙ্গত উপায়ে সকলেরই প্রয়োজন মিটবে।

পণ্ডিত সত্যকামজী বললেন, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি যুক্তিতর্কে বা অলৌকিক উপায়ে কিছুই হবে না। নিরামিষ ভোজন, বিলাসিতা বর্জন আর ব্রহ্মচর্যও বৃথা, এসব উৎকট ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা জোর করে চালানো যাবে না। আমাদের দরকার সত্যভাষণ। এই সভার সদস্যগণ যদি মনের কপাট খুলে অকপটচিত্তে নিজেদের মতলব প্রকাশ করেন তবে বিশ্বশান্তির উপায় সহজেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। আমরা বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি লাভ করেছি কিন্তু গামানুষ চরিত্রের কিছুই করতে পারি নি। তার কারণ, বিজ্ঞানী যে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করেন তাতে প্রতারণা নেই, জড়প্রকৃতি ঠকায় না, সেজন্য তথ্যনির্ণয় সুসাধ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রভুরা মিথ্যা ভিন্ন এক পা চলতে পারেন না। এঁদের গূঢ় অভিপ্রায় কি তা প্রকাশ করে না বললে শান্তির উপায় বেরুবে না। রোগের সব লক্ষণ না জানালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে কি করে ?

লর্ড গ্র্যাবার্থ ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে বললেন, কেউ যদি মনের কথা বলতে না চায় তবে কার সাধ্য তা টেনে বার করে। সত্য কথা বলাবেন কোন উপায়ে ?

জেনারেল কীপফ বললেন, ওষুধ খাইয়ে। সোডিয়ম পেণ্টোথাল শুনেছেন ? এর প্রভাবে সকলেই অবশ হয়ে সত্য

কথা বলে ফেলে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রদ্রোহীদের এই জিনিসটি খাইয়ে দোষ কবুল করানো হয়, তার পর পটাপট গুলি। আমরা মকদ্দমায় সময় নষ্ট করি না, উকিলকেও অনর্থক টাকা দিই না।

বিশ্ববিখ্যাত বিচক্ষণ বৃদ্ধ ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, বোকা, বোকা, সব বোকা। পেন্টোথালে লোকে জড়বুদ্ধি হয়। সত্য কথা বলে বটে, কিন্তু বিচারের ক্ষমতা লোপ পায়। আমরা এখানে নেশা করে আড্ডা দিতে আসি নি, জটিল বিশ্বরাজনীতিক সমস্যার সমাধান করতে এসেছি। পেন্টোথালের কাজ নয়, আমার সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইনজেকশন দিতে হবে। গাঁজা থেকে উৎপন্ন, অতি নিরীহ বস্তু, কিন্তু অব্যর্থ। যতই ঝানু কূটবুদ্ধি হন না কেন, ঘাড় ধরে আপনাকে সত্য বলাবে, অথচ বুদ্ধির কিছুমাত্র হানি করবে না। স্থায়ী অনিষ্টেরও ভয় নেই, এক ঘণ্টা পরে প্রভাব কেটে যাবে, তার পর যত খুশি মিথ্যা বলতে পারবেন। ওষুধটি আমার সঙ্গেই আছে, সভাপতি মশায় যদি আদেশ দেন তবে সকলকেই এক মুহূর্তে সত্যবাদী করে দিতে পারি।

কাউন্ট নটেনফ প্রশ্ন করলেন, পরীক্ষা হয়েছে?

ভৃঙ্গরাজ উত্তর দিলেন, হয়েছে বইকি। বিস্তর ইঁদুর আর গিনিপিগের উপর পরীক্ষা করেছি।

জেনারেল কীপফ অট্টহাস্য করে বললেন, ইঁদুরের আবার সত্য মিথ্যা আছে নাকি? আপনি তাদের ভাষা জানেন?

নন্দী বললেন, নিশ্চয় জানি, তাদের ভঙ্গী দেখে বুঝতে

পারি। যদি বাঁয়ে ল্যাজ নাড়ে তবে জানবেন মতলব ভাল নয়, উদ্দেশ্য গোপন করছে। যদি ডাইনে নাড়ে তবে বুঝবেন তার মনে কোনও ছল নেই। তা ছাড়া আমার এক শিষ্যের উপর পরীক্ষা করেছি, তার ফলে বেচারার পত্নী বিবাহভঙ্গের মামলা এনেছে।

সভাপতি চং লিং বললেন, সন্দেহ রাখবার দরকার কি, এই-খানেই পরীক্ষা হক না। কে ভলাণ্টিয়ার হতে চান—বিজ্ঞান-প্রেমী কে আছেন—এগিয়ে আসুন।

ধর্মদাসজী ডাক্তার নন্দীর কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন, আমি রাজী আছি, দিন ইনজেকশন।

নন্দী তখনই পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটি ম্যাগাজিন-সিরিঞ্জ বার করে ধর্মদাসের হাতে ফুঁড়ে পনর ফোঁটা আন্দাজ চালিয়ে দিলেন। ওষুধের ক্রিয়ার জন্য দু মিনিট সময় দিয়ে সভাপতি বললেন, ধর্মদাসজী, এইবারে আপনার মনের কথা খুলে বলুন।

ধর্মদাস বললেন, নিরামিষ ভোজন, খাদ্যে মসলা বর্জন, সর্ব বিষয়ে অবিলাসিতা আর নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য। তবে আমিও মাঝে মাঝে আদর্শচ্যুত হয়েছি।

জেনারেল কীপফ সহাস্যে বললেন, এসব পাগলদের উপর পরীক্ষা করা বৃথা, এরা স্বাভাবিক অবস্থাতেও বেশী মিথ্যা বলে না, যা বিশ্বাস করে তাই প্রচার করে। আসুন, আমাকেই ইনজেকশন দিন, সত্য মিথ্যা কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।

লর্ড গ্র্যাবার্থ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে কীপফের হাত ধরে বললেন, করেন কি, ক্ষান্ত হন, এসব বিশ্রী ব্যাপারে থাকবেন না। যার আত্মসম্মানবোধ আছে সে কখনও এতে রাজী হতে পারে? অভিপ্রায় গোপনে আমাদের বিধিদত্ত অধিকার, একটা হাতুড়ে ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তা ছেড়ে দিতে পারি না। স্থূল মিথ্যা অতি বর্বর জিনিস তা স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্ম মিথ্যা অতি মহামূল্য অস্ত্র, তাগ করে লাগাতে পারলে জগৎ জয় করা যায়, তা আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পরিমার্জিত মিথ্যাই সভ্যসমাজের আশ্রয় আর আচ্ছাদন, সমস্ত লোকাচার আর রাজনীতি তার উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনার লজ্জা নেই? এই সভার মধ্যে উলঙ্গ হওয়া যা মনের কথা প্রকাশ করাও তা।

জেনারেল কীপফ নিরস্ত হলেন না, গ্র্যাবার্থের মুঠো থেকে নিজের হাত সজোরে টেনে বাড়িয়ে দিলেন, ডাক্তার নন্দীও তৎক্ষণাৎ সূচীপ্রয়োগ করলেন। তার পর কীপফ দুই হাতে গ্র্যাবার্থকে জাপটে ধরে বললেন, শীগগির, এঁকেও ফুঁড়ে দিন, একটু বেশীকরে দেবেন। ডাক্তার ভৃঙ্গ-রাজ নন্দী ডবল মাত্রা ভেরাসিটিন চালিয়ে দিলেন। কীপফের স্থূল লোমশ বাহুর বন্ধনে ছটপট করতে করতে গ্র্যাবার্থ বললেন, একি অত্যাচার! আপনারা সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছেন। সভাপতি মশায়, আপনি একেবারে অকর্মণ্য। উঠুন, এখনই আমার রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কাছে টেলিফোন করুন।

কীপফ বললেন, বড় বেয়াড়া পেশেন্ট, হাড়ে হাড়ে রোগ ঢুকেছে, লাগান আরও দুই ডোজ। ডাক্তার নন্দী বিনা বাক্যব্যয়ে আর একবার ফুঁড়ে দিলেন। তার পর গ্র্যাবার্থ ক্রমশঃ শান্ত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, শুধু আমাদের দুজনকে কেন? ওই বজ্জাত গুণ্ডা নটেনফটাকেও দিন।

নটেনফ ঘুঁষি তুলে গ্র্যাবার্থকে আক্রমণ করতে এলেন। কীপফ তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, থামুন থামুন, সত্য বলতে এত ভয় কিসের? আমরা সকলেই তো পরস্পরের অভিসন্ধি বুঝি, খোলসা করে বললে কি এমন ক্ষতি হবে?

নটেনফ চুপি চুপি বললেন, আরে তোমাদের আমি গ্রাহ্য করি নাকি? আমার আপত্তির কারণ আলাদা। আন্তর্জাতিক অশান্তির চেয়ে পারিবারিক অশান্তি আরও ভয়ানক।

এমন সময় দর্শকদের গ্যালারি থেকে কাউণ্টেস নটেনফ তারস্বরে বললেন, দিন জোর করে ফুঁড়ে, কাউণ্ট অতি মিথ্যাবাদী, চিরকাল আমাকে ঠকিয়েছে।

এই হট্টগোলের সুযোগে ডাক্তার নন্দী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে নটেনফের নিতম্বে ভেরাসিটিন প্রয়োগ করলেন। নটেনফপত্নী চিৎকার করে বললেন, এইবার কবুল কর তোমার প্রণয়িনী কে কে।

সভাপতি চং লিং বললেন, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, প্রণয়িনীরা পালিয়ে যাবে না, এখন আমাদের কাজ করতে দিন। লর্ড গ্র্যাবার্থ, কাউণ্ট নটেনফ, জেনারেল কীপফ, এখন একে একে খুলে বলুন আপনাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য কি।

গ্র্যাবার্থ বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য অতি সোজা, জোর যার মুলুক তার এই হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি। পরহিতৈষিতা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বেশ, কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তার স্থান নেই। আমরা সভ্য অসভ্য শক্তিমান দুর্বল সকল জাতির কাছ থেকেই যথাসাধ্য আদায় করতে চাই, এতে ন্যায়-অন্যায়ের কথা আসে না। দুধ খাবার সময় বাছুরের দুঃখ কে ভাবে? যখন মাংসের জন্য বা অন্য প্রয়োজন গরু ভেড়া বাঘ সাপ ইঁদুর মশা মারেন তখন জীবের স্বার্থ গ্রাহ্য করেন কি? উদ্‌ভিদেরও প্রাণ আছে, অহিংস হ'য়ে পাথর খেয়ে বাঁচতে পারেন কি? আমরা সর্বপ্রকার সুখভোগ করতে চাই, তার জন্য সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাদের নিরঙ্কুশ হবার উপায় নেই, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, নিজের স্বভাবগত কোমলতা আছে—যাকে মূর্খরা বলে বিবেক বা ধর্মজ্ঞান। তা ছাড়া স্বজাতি আর মিত্রস্থানীয় বিজাতির মধ্যে জনকতক দুর্বলচিত্ত ধর্মিষ্ঠ আছে, তাদের সব সময় ধাপ্পা দেওয়া চলে না, ঠাণ্ডা রাখবার জন্য মাঝে মাঝে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই সভার যা উদ্দেশ্য তা কোনও কালে সিদ্ধ হবে না। প্রতিপক্ষের ভয়ে বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পাকা ব্যবস্থায় রাজী নই, আজ যা ছাড়ব সুবিধা পেলেই কাল আবার দখল করব। অভিব্যক্তিবাদ তো আপনারা জানেন, বেশী কিছু বলবার দরকার নেই।

নটেনফ বললেন, আমাদের নীতিও ঠিক ওই রকম।

কর্মপদ্ধতির অল্প স্বল্প ভেদ আছে, কিন্তু মতলব একই। আমরা জাত্যংশে সর্বশ্রেষ্ঠ, জগতের একাধিপত্য একদিন আমাদের হাতে আসবেই, ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হক আমরা মনস্কামনা সিদ্ধ করব।

কীপফ বলেন, আমরাও তাই বলি, তবে আপনাদের আর আমাদের পদ্ধতিতে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশটি প্রকাণ্ড, এখনও অন্য দেশকে শোষণ করবার বিশেষ দরকার হয় নি, তবে ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা এখন থেকেই হাত পাকাচ্ছি।

অবলদাসজী মাথা চাপড়ে বললেন, হায় হায়, এর চেয়ে মিথ্যা কথাই যে ভাল ছিল! তবু একটা আশা ছিল যে এরা এখন ক্ষমতার দম্ভে বুঝতে পারছে না, পরে হয়তো এদের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হবে। আচ্ছা লর্ড গ্র্যাবার্থ, একটা প্রশ্নের উত্তর দিন। আমরা অধীন জাতিরা একটু একটু করে শক্তিমান হচ্ছি। আপনারা যাই বলুন, জগতে সকল দেশে এখনও সাধু লোক আছেন, তাঁরা আমাদের সহায়। আমরা একদিন বন্ধনমুক্ত হবই। আমাদের মনে যে বিদ্বেষ জমছে তার ফলে ভবিষ্যতে আপনাদের কি সর্বনাশ হবে তা বুঝছেন? আমাদের সঙ্গে যদি এখনই ন্যায়সংগত চুক্তি করেন এবং তার জন্য অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করেন তবে ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের একেবারে বঞ্চিত করব না। এই সহজ সত্য আপনাদের মাথায় ঢোকে না কেন?

গ্র্যাবার্থ বললেন, অবশ্যই ঢোকে। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে

এক আনা পাব সেই আশায় উপস্থিত ষোল আনা কেন ছাড়ব? আমাদের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের জন্য মাথাব্যথা নেই।

অবলদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন। নিশ্চিন্ত মহারাজ আর একবার তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় কি, আমি আছি।

ধর্মদাস বললেন, ইনজেকশন দিয়ে কি ভাল হল? সবই তো আমাদের জানা কথা। আমাদের শাস্ত্রে অসুরপ্রকৃতির লক্ষণ দেওয়া আছে—

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।

—আজ আমার এই লাভ হল, এই অভীষ্ট বিষয় পাব, এই আমার আছে, আবার এই ধনও আমার হবে। ওই শত্রু আমি হত্যা করেছি, অপর শত্রুদেরও হত্যা করব। আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি যা করি তাই সফল হয়, আমি বলবান, আমি সুখী। আমি অভিজাত, আমার সদৃশ আর কে আছে।

সভাপতি সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের মতলব তো জানা গেল, এখন শান্তির উপায় আলোচনা করুন।

গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ সমস্বরে বললেন, আমরা বেশ আছি, শান্তি টান্তি বাজে কথা, আমরা নখদন্তহীন ভালমানুষ হতে চাই না, পরস্পর কাড়াকাড়ি মারামারি করে মহানন্দে জীবন-যাপন করতে চাই।

এই সভার একজন সদস্য এতক্ষণ পিছন দিকে চুপচাপ বসে ছিলেন, ইনি আচার্য ব্যোমবজ্র দর্শন-বিজ্ঞানশাস্ত্রী, এক দিস্তা ফুলস্ক্যাপে এঁর সমস্ত উপাধি কুলয় না। এখন ইনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বিশ্বশান্তির উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

ডাক্তার ভৃঙ্গরাজ নন্দী বললেন, আপনারও একটা ইনজেকশন আছে নাকি?

ব্যোমবজ্র উত্তর দিলেন, পৃথিবীর কোটি কোটি লোককে ইনজেকশন দেওয়া অসম্ভব। প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে আমার আবিষ্কৃত বিশ্বব্যাপক শান্তিস্থাপক বোমা, তার প্রভাবে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। এই বোমা থেকে যে আকস্মিক রশ্মি নির্গত হয় তা কস্মিক রশ্মির চেয়ে হাজার গুণ সূক্ষ্ম। তার স্পর্শে চিত্তশুদ্ধি, কাম ক্রোধ লোভাদির উচ্ছেদ এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি হয়।

গ্র্যাবার্থ ধমক দিয়ে বললেন, খবরদার, এখানে কোনও রহস্য প্রকাশ করবেন না। আমাদের টাকায় আপনি গবেষণা করেছেন। আপনার যা বলবার আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে গোপনে বলবেন।

নটেনফ লাফিয়ে বললেন, বাঃ, আমরাই তো ওঁর সমস্ত খরচ জুগিয়েছি! বোমা আমাদের।

কীপফ বললেন, আপনারা ড্যাম মিথ্যাবাদী। আমাদের রাষ্ট্র বহুদিন থেকে ওঁকে সাহায্য করে আসছে, ওঁর আবিষ্কার একমাত্র আমাদের সম্পত্তি।

ব্যোমবজ্র দুই হাতে বরাভয় দেখিয়ে বললেন, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমার বোমায় আপনাদের সকলেরই স্বত্ব আছে, আপনারা সকলেই উপকৃত হবেন। অবলদাসজী, আপনাদেরও দলাদলি আর সকল দুর্দশা দূর হবে। এই বলে তিনি একটি ছোট বোঁচকা খুলতে লাগলেন।

সভায় তুমুল গোলযোগ শুরু হল, গ্র্যাবার্থ নটেনফ কীপফ এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বোঁচকাটি দখল করবার জন্য পরস্পরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন।

ধর্মদাস বললেন, ব্যোমবজ্রজী, আর দেরি করছেন কেন, ছাড়ুন না আপনার বোমা।

ব্যোমবজ্রকে কিছু করতে হল না, সদস্যদের টানাটানিতে বোমাটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভুঁইপটকার মতন ফেটে গেল। কোনও আওয়াজ কানে এল না, কোনও ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দ আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকবার পর গ্র্যাবার্থ বললেন, শাস্ত্রীর বোমাটি ভাল, মনে হচ্ছে আমরা সবাই সাম্য মৈত্রী আর স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। নটেনফ কীপফ, তোমাদের আমি বড্ড ভালবাসি হে। অবলদাস, তোমরাও আমার পরমাত্মীয়। একটা নতুন ইণ্টারন্যাশনাল অ্যানথেম রচনা করেছি শোন—ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই। এস, এখন একটু কোলাকুলি করা যাক।

নিশ্চিন্ত মহারাজ অবলদাসের পিঠ চাপড়ে সগর্বে বললেন, হুঁ হুঁ, আমি বলছিলাম কিনা ?

সভায় বিজয়াদশমী আর ঈদ মুবারকের ভ্রাতৃভাব উথলে উঠল। খানিক পরে নটেনফ বললেন, আসুন দাদা, এখন বিশ্বের কয়লা তেল গম গরু ভেড়া শুয়োর তুলো চিনি রবার লোহা সোনা ইউরেনিয়ম প্রভৃতির একটা বাটোয়ারা হক। জন-পিছু সমান হিস্‌সা, কি বলেন ?

ব্যোমবজ্র সহাস্যে বললেন, কোনও দরকার হবে না, আপনারা সকলেই নশ্বর দেহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিরালম্ব বায়ুভূত হয়ে গেছেন। এখন নরকে যেতে পারেন বা আবার জন্মাতে পারেন বা একদম উবে যেতে পারেন, যার যেমন অভিরুচি।

কীপফ বললেন, আপনি কি বলতে চান আমরা মরে ভূত হয়ে গেছি ? আমি ভূত মানি না।

ব্যোমবজ্র বললেন, নাই বা মানলেন, তাতে অন্য ভূতদের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

মৃতবৎসা বসুন্ধরা একটু জিরিয়ে নেবেন তার পর আবার সসত্ত্বা হবেন। দুরাত্মা আর অকর্মণ্য সন্তানের বিলোপে তাঁর দুঃখ নেই। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। তিনি অলসগমনা, দশ-বিশ লক্ষ বৎসরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে না, সুপ্রজাবতী হবার আশায় তিনি বার বার গর্ভধারণ করবেন।

১৩৫২

অটলবাবুর অন্তিম চিন্তা

শয্যাশায়ী অটল চৌধুরী বললেন, দেখ ডাক্তার, আমি তোমার ঠাকুরদার চেয়েও বয়সে বড়, আমাকে ঠকিও না। মুখ খুলে বল মেজর হালদার কি বলে গেলেন। আর কতক্ষণ বাঁচব?

ডাক্তারবাবু বললেন, কেন সার আপনি ও কথা বলছেন, মরণ-বাঁচন কি মানুষের হাতে? আমরা কতটুকুই বা জানি। ভগবানের যদি দয়া হয় তবে আপনি আরও অনেক দিন বাঁচবেন।

—বাঁচিয়ে রাখাই কি দয়ার লক্ষণ? তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে আর জ্বালিও না। এখন ডাক্তারি ধাপ্পাবাজি ছেড়ে দিয়ে সত্যি কথা বল। মরবার আগে আমি মনে মনে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

—বেশ তো, এখনই করুন না, দু-দশ বছর আগে করলেই বা দোষ কি।

—তুমি ডাক্তারিই শিখেছ, বিজনেস শেখ নি। আরে, বছর শেষ না হলে কি সাল-তামামী হিসেব-নিকেশ করা যায়? ঠিক মরবার আগেই জীবনের লাভ-লোকশান খতাতে চাই—অবশ্য যদি জ্ঞান থাকে।

এমন সময় পুরুত ঠাকুর হরিপদ ভটচাজ এসে বললেন, কর্তাবাবু, প্রায়শ্চিত্তটা হয়ে যাক, মনে শান্তি পাবেন।

—কেন বাপু, আমি কি মানুষ খুন করেছি, না পরস্ত্রী হরণ

করেছি, না চুরি-ডাকাতি জাল-জুয়াচুরি আর মহুলির ব্যবসা করেছি ?

হরিপদ জিব কেটে বললেন, ছি ছি, আপনার মতন সাধু-পুরুষ কজন আছেন ? তবে কিনা সকলেরই অজ্ঞানকৃত পাপ কিছু কিছু থাকে, তার জন্যই প্রায়শ্চিত্ত।

—দেখ ভটচাজ, আমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নই, ভদ্রলোকের যতটুকু দুষ্কর্ম না করলে চলে না ততটুকু করেছি। তার জন্য আমার কিছুমাত্র খেদ নেই, নরকের ভয়ও নেই। তবে প্রায়শ্চিত্ত করলে তোমরা যদি মনে শান্তি পাও তো করতে পার। কিন্তু এখানে নয়, নীচে পূজোর দালানে কর গিয়ে। ঘণ্টার আওয়াজ যেন না আসে।

হরিপদ 'যে আজ্ঞে' বলে চলে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, ওঃ কি পাষণ্ড ! মরতে বসেছে তবু ধর্মে মতি হল না।

অটলবাবুর পৌত্রী রাধারানী এসে বললে, দাদাবাবু, বৃন্দাবন বাবাজী তাঁর কীর্তনের দল নিয়ে এসেছেন। মা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি একটু নাম শুনবে কি ?

—খবরদার। আমি এখন নিরিবিলিতে থাকতে চাই, চেঁচামেচি ভাল লাগে না। শ্রাদ্ধের দিন যত খুশি কীর্তন শুনিস —শীতল বাতাস ভাল লাগে না সখী, আমার বুকের পাঁজর ঝাঁজর হল—যত সব ন্যাকামি।

রাধারানী ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে গেল। ডাক্তার বললেন, সার, আপনি বড় বেশী কথা বলছেন। রাত হয়েছে, এখন চুপ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

—বেশী কথা তোমরাই বলছ। আর দেরি করো না, যা জিজ্ঞাসা করেছি তার স্পষ্ট উত্তর দাও।

ডাক্তার তাঁর স্টেথোস্কোপের নল চটকাতে চটকাতে বললেন, দু-চার ঘণ্টা হতে পারে, দু-চার দিনও হতে পারে, ঠিক বলা অসম্ভব। ইনজেকশনটা দিয়ে দি, আপনি অক্সিজেন শুঁকতে থাকুন, কষ্ট কমবে।

যথাকর্তব্য করে ডাক্তার অটলবাবুর বিধবা পুত্রবধূকে বললেন, হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে, আজ রাত বোধ হয় কাটবে না। নার্স ওঁর ঘরে থাকুক, আমি এই পাশের ঘরে রইলুম।

অটলবাবু অত্যন্ত হিসাবী লোক, আজীবন নানারকম কারবার করেছেন। তাঁর বয়স আশি পেরিয়েছে, শরীর রোগে অবসন্ন, কিন্তু বুদ্ধি ঠিক আছে। মরণ আসন্ন জেনে তিনি মনে মনে ইহলোকের ব্যালান্স-শীট এবং পরলোকের একটা আন্দাজী প্রসপেকটস খাড়া করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অটলবাবুর মনে পড়ল, বহুকাল পূর্বে কলেজে পড়বার সময় মৃচ্ছকটিকের একটি শ্লোক তাঁর ভাল লেগেছিল।

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং
ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ স জীবতি॥

—দুঃখ অনুভবের পরই সুখ শোভা পায়, যেমন ঘোর

অন্ধকারে দীপদর্শন। কিন্তু যে লোক সুখভোগের পর দরিদ্রতা পায় সে শরীর ধারণ করে মৃতের ন্যায় জীবিত থাকে।

অটলবাবু ভাবলেন, ভুল, মস্ত ভুল। তিনি প্রথম ও মধ্য জীবনে বিস্তর সুখভোগ করেছেন, কিন্তু শেষ বয়সে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাঁকে স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়বিয়োগের শোক এবং ব্যবসায়ে বড় রকম লোকসান সইতে হয়েছে, সর্বস্বান্ত না হলেও তিনি আগের তুলনায় দরিদ্র হয়েছেন। বয়স যত বাড়ে সময় ততই ছোট হয়ে যায়; অন্তিম কালে অটলবাবুর মনে হচ্ছে তাঁর সমস্ত জীবন মুহূর্তমাত্র, সমস্ত সুখ দুঃখ তিনি এক সঙ্গেই ভোগ করেছেন এবং সবই এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুখভোগের পর দুঃখ পেয়েছেন—শুধু এই কারণেই সুখের চেয়ে দুঃখকে বড় মনে করবেন কেন? জীবনের খাতায় লাভ-লোকসান দুই পাকা কালিতে লেখা রয়েছে, তাতে দেখা যায় তাঁর খরচের তুলনায় জমাই বেশী, মোটের উপর তিনি বঞ্চিত হন নি। অন্য লোকে যাই বলুক, তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন।

কিন্তু একটা খটকা দেখা যাচ্ছে। তিনি নিজে ভাগ্যবান হলেও যারা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়জন ছিল তারা হতভাগ্য, অনেকে বহু দুঃখ পেয়ে অকালে মরেছে। তাদের দুঃখ অটলবাবু নিজের বলেই মনে করেন এবং তা লোকসানের দিকে ফেললে লাভের অঙ্ক খুব কমে যায়। শুধু তাই নয়, অন্যান্য যে সব লোককে তিনি আজীবন আশেপাশে দেখছেন তাদেরও অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। পূর্বে তাদের কথা তিনি ভাবেন

নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারাও নিতান্ত আপন জন। তাদের দুঃখও যদি নিজের বলে ধরেন তবে জমাখরচ কষলে লোকসানই দেখা যায়।

অটলবাবু স্থির করতে পারলেন না তিনি জীবনে মোটের উপর সুখ বেশী পেয়েছেন কি দুঃখ বেশী পেয়েছেন। তিনি যদি ভক্ত হতেন তবে বলতে পারতেন—'ধন্য হরি রাজ্যপাটে, ধন্য হরি শ্মশানঘাটে'। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন—এই খ্রীষ্টানী প্রবোধবাক্যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। অটলবাবু শুনেছেন, যিনি পরমহংস তিনি সমস্ত জীবের সুখদুঃখ নিজের বলেই মনে করেন; সুখ আর দুঃখে কাটাকাটি হয়ে যায়, তার ফলে তিনি সুখীও হন না দুঃখীও হন না। কিন্তু অটলবাবু পরমহংস নন, তা ছাড়া তিনি জগতে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী দেখতে পান। তিনি যদি দুঃখের দিকে পিছন ফিরে জীবন উপভোগ করতে পারতেন তবে রবীন্দ্রনাথের মতন বলতে পারতেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দে বিরাজে।

আরও বলতে পারতেন—

আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বের দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষ কোটি গ্রহ তারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে,
বিকৃতি না ঘটায় স্খলন···

ভাগ্যদোষে অটলবাবু ভক্ত নন, কবি নন, ভাবুক নন, দার্শনিক নন, সরল বিশ্বাসীও নন। তিনি নানা বিষয়ে ঠোকর মেরেছেন কিন্তু কিছুই আয়ত্ত করতে পারেন নি, আজীবন সংশয়ে কাটিয়েছেন কিন্তু কোনও বিষয়েই নিষ্ঠা রাখতে পারেন নি। তাঁর মূলধন কি তাই তিনি জানেন না, লাভ-লোকসান খতাবেন কি করে? শুধু এইটুকুই বলতে পারেন—অনেকের তুলনায় তিনি ভাগ্যবান, অনেকের তুলনায় তিনি হতভাগ্য। এ সম্বন্ধে আর তিনি বৃথা মাথা ঘামাবেন না, জ্ঞান থাকতে থাকতে তাঁর ভবিষ্যৎটা একটু আন্দাজ করার চেষ্টা করবেন। তাঁর আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই। তিনি মরলে কারও আর্থিক ক্ষতি বা মানসিক দুঃখ হবে না, যে অল্প আয় আছে তা বন্ধ হবে না, বরং ইনশিওরান্সের একটা মোটা টাকা ঘরে আসবে। তিনি এখন আত্মীয়দের গলগ্রহ মাত্র, তারা বোধ হয় মনে মনে তাঁর মরণ কামনা করে।

অটলবাবু কি আবার জন্মাবেন? তাঁর গতজন্মের কথা কিছুই মনে নেই। জাতিস্মর লোকের বিবরণ মাঝে

মাঝে খবরের কাগজে পাওয়া যায়, কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। মালবীয়জীর যখন কায়কল্প চিকিৎসা চলছিল তখন এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা খবর পাঠাচ্ছিলেন—পণ্ডিতজীর পাকা চুল সমস্ত কাল হয়ে গেছে, নূতন দাঁতও উঠছে। নির্জলা মিথ্যা কথা লিখতে এঁদের বাধে না। পুনর্জন্মের কথা মনে না থাকে তবে এক জন্মের রামবাবুই যে অন্য জন্মে শ্যামবাবু হয়েছেন তার প্রমাণ কি? তার পর স্বর্গ মর্ত্য। তিনি এক পাদ্রির কাছে শুনেছিলেন, যিশু খ্রীষ্টের শরণ নিলে অনন্ত স্বর্গ, না নিলে অনন্ত নরক। এরকম ছেলেমানুষী কথায় ভুলবেন অটলবাবু এমন বোকা নন। আমাদের পুরাণে আছে, যার পাপ অল্প সে আগে অল্প কাল নরকভোগ করে, তার পর দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করে, পুণ্যক্ষয় হলে আবার জন্মায়। যার পুণ্য অল্প সে অল্প কাল স্বর্গবাসের পর দীর্ঘ কাল নরকবাস করে, তার পর আবার জন্মায়। এই মত খ্রীষ্টানী মতের চেয়ে ভাল, কিন্তু মানুষের পাপ-পুণ্য মাপা হবে কী করে? পাপ-পুণ্য তো যুগে যুগে বদলাচ্ছে। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে মুরগি খেলে পাপ হত, এখন আর হয় না। পুরাকালের হিন্দুরা অন্যান্য নিষিদ্ধ মাংসও খেত, ভবিষ্যতে আবার খাবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সবাই বলে নরহত্যা মহাপাপ, কিন্তু এই সেদিন শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলেরাও বেপরোয়া খুন করেছে, বুড়োরা উৎসাহ দিয়ে বলেছে—এ হল আপদ্‌ধর্ম, সাপ মারলে পাপ হয় না, কে ঢোঁড়া কে কেউটে তা চেনবার দরকার

নেই। পাপ-পুণ্যের যখন স্থিরতা নেই তখন স্বর্গনরক অবিশ্বাস্য।

তবে কি অটলবাবু স্পিরিচুয়ালিস্টদের পরলোকে যাবেন —যা স্বর্গও নয় নরকও নয়? আজকাল ইওরোপ-আমেরিকার বৃত্তান্তের মতন পরলোকের বৃত্তান্তও অনেক ছাপা হচ্ছে। দুর্বলচিত্ত লোকে বিপদে পড়লে যেমন কবচ-মাদুলি ধারণ করে, জ্যোতিষী বা গুরুর শরণাপন্ন হয়, তেমনি শান্তির প্রত্যাশায় পরলোকের কথা পড়ে। অনেক বৎসর পূর্বে অটলবাবু একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন, এখন তা মনে পড়ে গেল।—তিনি বিদেশে এক বন্ধুর বাড়ি অতিথি হয়েছেন। রাত্রিতে আহারের পর তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে শুতে যাবার সময় দেখলেন, পাশে একটি তালা-লাগান ঘর আছে। শোবার কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলেন, পাশের ঘরের তালা খোলা হল, আবার বন্ধ করা হল। তারপর অটলবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। একটু পরেই গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল, পাশের ঘরে যেন হাতাহাতি মারামারি চলছে। অনেক রাত পর্যন্ত এইরকম চলল, অটলবাবু ঘুমুতে পারলেন না। পরদিন বাড়ির কর্তা তাঁকে বললেন, আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছে তার জন্য আমি বড় দুঃখিত। ব্যাপার কি জানেন—আমার একটি ছেলে অল্প বয়সে মারা যায়, তার গর্ভধারিণী রোজ রাত্রে থালায় ভরতি করে তার জন্য ওই ঘরে খাবার রাখেন। কিন্তু ছেলে খেতে পায় না, তার পূর্বপুরুষরা দল বেঁধে এসে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করেন।

এই স্বপ্নের কথা মনে পড়ার পর অটলবাবু একটি বিভীষিকা দেখলেন। মনে হ'ল তাঁর বাবা বলছেন, অট্‌লা, প্রণাম কর, এই ইনি তোর পিতামহ, ইনি প্রপিতামহ, ইনি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, ইনি অতিবৃদ্ধ—ইত্যাদি ইত্যাদি। অটলবাবু দেখলেন, তাঁর বংশের অসংখ্য ঊর্ধ্বতন স্ত্রীপুরুষ প্রণাম নেবার জন্য সামনে কিউ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই তাঁর পাঁচ নম্বরপূর্বপুরুষ—প্রবলপ্রতাপ জমিদার, মাথায় টিকি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষ, কাঁধে পইতের গোছা, পায়ে খড়ম—দেখলেই বোধ হয় ব্যাটা ডাকাতের সর্দার, নরবলি দিত। ওই উনি, যাঁর দাঁতে মিসি, নাকে নথ, কানে মাকড়ির ঝালর, পায়ে বাঁকমল, কোমরে গোট, অটলবাবুর অতিবৃদ্ধ প্রমাতামহী—ও মাগী নিশ্চয় ডাইনী, সতিনপোকে বিষ খাইয়ে মেরেছিল। দলের মধ্যে সাধুপুরুষ আর সাধ্বী স্ত্রীও অনেক আছেন, কিন্তু অটলবাবু তো ভাল মন্দ বেছে প্রণাম করতে পারেন না। তা ছাড়া তাঁর বয়স এত হয়েছে যে কোনও গুরুজন আর বেঁচে নেই, তিনি প্রণাম করাই ভুলে গেছেন। ছেলেবেলায় তিনি তাঁর বাবাকে দেখলে হুঁকো লুকোতেন, কিন্তু এখন এই পঙ্গপালের মতন পূর্বপুরুষদের খাতির করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর প্রিয়জন এবং অপ্রিয়-জনও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ হাসিমুখে কেউ ছলছল চোখে কেউ ভ্রূকুটি করে তাঁকে দেখছে। শুধু মানুষ নয়, মানুষের পিছনে অতি দূরে জন্তুর দলও রয়েছে, পশু সরীসৃপ মাছ কৃমি কীট কীটাণু পর্যন্ত। এরাও তাঁর পূর্ব-

পুরুষ, এরাও তাঁর জ্ঞাতি, সকলের সঙ্গেই তাঁর রক্তের যোগ আছে। কি ভয়ানক, ইহলোকের জনকয়েক আত্মীয়বন্ধুর সংশ্রব ত্যাগ করে তাঁকে কি পরলোকের প্রেতারণ্যে বাস করতে হবে? ওখানে সঙ্গী রূপে কাকে তিনি বরণ করবেন, কাকে বর্জন করবেন? অটলবাবু অস্পষ্টস্বরে বললেন, দূর হ, দূর হ।

নার্স কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে ডাকছেন? অটলবাবু আবার বললেন, দূর হ, দূর হ। নার্স বিরক্ত হয়ে তার চেয়ারে গিয়ে বসল এবং আবার ঢুলতে লাগল।

বিকারের ঘোর কাটিয়ে উঠে অটলবাবু ভাবতে লাগলেন—পুনর্জন্ম নয়, স্বর্গ নয়, স্পিরিচুয়াল প্রেতলোকও নয়। কোথায় যাবেন? মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়, দেহের উপাদান পৃথিবীর জড় বস্তুতে লয় পায়। মৃত ব্যক্তির চেতনাও কি বিরাট বিশ্বচেতনায় লীন হয়? আমিই অটল চৌধুরী—এই বোধ কি তখনও থাকবে? অটলবাবু আর ভাবতে পারেন না, মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

শেষ রাত্রে অটলবাবুর নাড়ী নিঃশ্বাস আর বুক পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ঘণ্টাখানেক হল গেছেন। আশ্চর্য মানুষ, হরিনাম নয়, রামধুন নয়, তারকব্রহ্মনাম নয়, কিছুই শুনলেন না, ভদ্রলোক লাভ-লোকসান কষতে কষতেই মরেছেন। বোধ হয় হিসেব মেলাতে পারেন নি দেখুন না, ভ্রূ একটু কুঁচকে রয়েছে।

পুত্রবধূ বললেন, তা বেশ গেছেন, নিজেও বেশী দিন ভোগেন নি, আমাদেরও ভোগান নি। চিকিৎসার খরচও তো কম নয়।

অটলবাবুর কাগজপত্র হাঁতড়ে দেখে তাঁর পৌত্র বললে, এঃ, বুড়ো ঠকিয়েছে, যা রেখে গেছে তা কিছুই নয়।

অনুরক্ত বন্ধুরা বললেন, একটা ইন্দ্রপাত হল। এমন খাঁটি মানুষ দেখা যায় না। ইনি স্বর্গে যাবেন না তো যাবে কে? কি বলেন দত্ত মশাই?

হারাধন দত্ত মশাই পরলোকতত্ত্বজ্ঞ; যদিও পরলোক দেখবার সুযোগ এখনও পান নি। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, উঁহু স্বর্গে যাওয়া অত সহজ নয়, দরজা খোলা পাবেন না; উনি যে কিছুই মানতেন না। অ্যাস্ট্রাল প্লেনেই আটকে থাকবেন, ত্রিশঙ্কুর মতন।

হরিপদ ভটচাজ মনে মনে বললেন, তোমরা ছাই জান, পাষণ্ড এতক্ষণ নরকে পৌঁছে গেছে।

অটলবাবু কোথায় গেছেন তিনিই জানেন। অথবা তিনিও জানেন না।

১৩৫৫

রাজভোগ

পৌষ মাস, সন্ধ্যাবেলা। একটি প্রকাণ্ড মোটর ধর্মতলায় অ্যাংলোমোগলাই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। মোটরটি সেকেলে কিন্তু দামী। চালকের পাশ থেকে একজন চোপদার জাতীর লোক নেমে পড়ল। তার হাতে আসাসোঁটা নেই বটে কিন্তু মাথায় একটি জরি দেওয়া জাঁকালো পাগড়ি আছে, তাতে রূপোর তকমা আটা; পরনে ইজের-চাপকান, কোমরে লাল মখমলের পেটি, তাতেও একটি চাপরাস আছে। লোকটি তার প্রকাণ্ড গোঁফে তা দিতে দিতে সগর্বে হোটেলে ঢুকে ম্যানেজারকে বললে, পাতিপুরকা রাজাবাহাদুর আয়ে হেঁ।

ম্যানেজার রাইচরণ চক্রবর্তী শশব্যস্তে বেরিয়ে এল এবং মোটরের দরজার সামনে হাত জোড় করে নতশিরে বলল, মহারাজ, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! দয়া করে নেমে এই গরিবের কুটীরে পায়ের ধুলো দিতে আজ্ঞা হক।

পাতিপুরের রাজা বাহাদুর ধীরে ধীরে মোটর থেকে নামলেন। তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে, দেহ আর পাকা গোঁফ-জোড়াটি খুব শীর্ণ, মাথায় যেটুকু চুল বাকী আছে তাই দিয়ে টাক ঢেকে সিঁথি কাটবার চেষ্টা করেছেন। পরনে জরিপাড় সূক্ষ্ম ধুতি আর রেশমী পাঞ্জাবি, তার উপর দামী শাল, পায়ে শুঁড়ওয়ালা লাল লপেটা। তিনি গাড়ি থেকে নেমে ভিতরের মহিলাটিকে বললেন, নেমে এস। মহিলা বললেন, আমি আর

নেমে কি করব, গাড়িতেই থাকি। তুমি যা খাবে খেয়ে এস, দেরি করো না যেন। রাজা বললেন, তা কি হয়, তুমিও এস। রাইচরণ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে, নামতে আজ্ঞা হক রানী-মা, আপনার শ্রীচরণের ধুলো পড়লে হোটেলের বরাত ফিরে যাবে।

মহিলাটি বোধ হয় সুন্দরী ও যুবতী, কিন্তু ঠিক বলা যায় না; তাঁর সজ্জা আর প্রসাধন এমন পরিপাটি যে রূপযৌবনের কতটা আসল আর কতটা নকল তা বোঝবার উপায় নেই। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন। রাইচরণ বিনয়ে কুঁজো হয়ে সামনের দিকে জোড় হাত নাড়তে নাড়তে পথ দেখিয়ে রাজাবাহাদুর ও তাঁর সঙ্গিনীকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং হেঁকে বললে, এই শীগগির রয়েল সেলুনের দরজা খুলে দে। হোটেলের সামনের বড় ঘরটিতে বসে যারা খাচ্ছিল তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে মহিলাটিকে দেখে ফিসফিস করে জল্পনা করতে লাগল।

একজন চাকর তাড়াতাড়ি একটা কামরা খুলে দিলে। ছোট খোপ, রং-করা কাঠের দেওয়াল,···মাঝে একটি টেবিল এবং দুটি গাদি-আঁটা চেয়ার। টেবিলটি সাদা চাদরে ঢাকা, দিনের বেলায় তাতে হলুদের দাগ দেখা যায়। এই কামরার পাশেই পর্দার আড়ালে আর একটি কামরা, তাতে এক সেট পুরনো কৌচ ও সেটি এবং একটি ছোট টেবিল, তার উপর তিন-চারটি গত সালের মাসিক পত্রিকা। দেওয়ালে কয়েকটি সিনেমা-তারার ছবি খবরের কাগজ থেকে কেটে এঁটে দেওয়া হয়েছে।

দুই মহামান্য অতিথিকে বসিয়ে ম্যানেজার রাইচরণ বললে, হুজুর, আজ্ঞা করুন কি এনে দেব। রাজাবাহাদুর সাগ্রহে বললেন, তোমার কি কি তৈরি আছে শুনি? রাইচরণ বললে, আজ্ঞে, তিন রকম পোলাও আছে—ভেটকি মাছের, মটনের আর পাঁঠার। কালিয়া আছে, কোর্মা আছে, কোপ্তা আছে ; মটন-চপ, চিংড়ি-কাটলেট, ফাউল-রোস্ট, ছানার পুডিং —হুজুরের আশীর্বাদে আরও কত কি আছে।

রাজাবাহাদুর খুশী হয়ে বললেন, বেশ বেশ, অতি উত্তম। আচ্ছা ম্যানেজার, তোমার এখানে বিরিয়ানি পোলাও হয়?

—হয় বই কি হুজুর, ঘণ্টা খানিক আগে অর্ডার পেলেই করে দিতে পারি। আমি তিন বচ্ছর ডুম্বাগড়ের নবাব সাহেবের রসুইঘরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলুম কিনা, সেখানেই সব শিখেছি। খুব খাইয়ে লোক ছিলেন নবাব সায়েব, এ বেলা এক দুম্বা, ও বেলা এক দুম্বা। বাবুর্চীদের রান্না তাঁর পছন্দ হত না, আমি তাদের কায়দার অনেক উন্নতি করেছি, তাই জন্যেই তো নবাব বাহাদুর খুশী হয়ে নিজের হাতে ফারসীতে আমাকে সাট্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন। দেখবেন হুজুর?

—থাক থাক। আচ্ছা, তোমার কায়দাটা কি রকম শুনি।

—বিরিয়ানি রান্নার? এক নম্বর বাঁশমতি চাল—এখন তার দাম পাঁচ টাকা সের, খাঁটি গাওয়া ঘি, ডুমো ডুমো মাংস, বাদাম পেস্তা কিশমিশ এবং হরেক রকম মসলা, গোলাপ জলে গোলা খোয়া ক্ষীর, মৃগনাভি সিকি রতি, দশ কৌটা ও-ডি-

কলোন, আলু একদম বাদ। চাল আর মাংস প্রায় সিদ্ধ হয়ে এলে তার ওপর দু মুঠো পেঁয়াজ-কুচি মুচমুচে করে ভেজে ছড়িয়ে দিই, তার পর দমে বসাই। খেতে যা হয় সে আর কি বলব!

রাজাবাহাদুরের জিবে জল এসে গেল, সুৎ করে টেনে নিয়ে বললেন, চমৎকার। আচ্ছা সামি কাবাব জান?

—হেঁ হেঁ, হুজুরের আশীর্বাদে মোগলাই ইংলিশ ফ্রেঞ্চ হেন রান্না নেই যা এই রাইচরণ চক্কত্তি জানে না। মাংস পিষে তার সঙ্গে ছোলার ডাল বাটা আর পেস্তা বাদাম মেশাতে হয়, তাতে আদা হিং পেঁয়াজ রসুন গরম মসলা ইত্যাদি পড়ে, তার পর চ্যাপটা লেচি গড়ে চাটুতে ভাজতে হয়। এই হল সামি কাবাব। ওঃ, খেতে যা হয় হুজুর তা বলবার কথা নয়।

রাজাবাহাদুর আবার সুৎ করে জিবের জল টেনে নিলেন, তার পর বললেন, আচ্ছা রাইচরণ, রোগন-জুশ জান?

মহিলাটি অধীর হয়ে বললেন, আঃ, ওসব জিজ্ঞেস করে কি হবে, যা খাবে তাই আনতে বল না।

রাজাবাহাদুর বললেন, আ হা হা ব্যস্ত হও কেন, খাওয়া তো আছেই, আগে একবার রাইচরণকে বাজিয়ে নিচ্ছি।

রাইচরণ বললে, বাজাবেন বই কি হুজুর, নিশ্চয় বাজাবেন। রোগন-জুশ হচ্ছে—

মহিলাটি আস্তে আস্তে উঠে পাশের কামরায় গিয়ে মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

—রোগন-জুশ হচ্ছে খাসি বা দুম্বার মাংস, শুধু ঘি

সিদ্ধ, জল একদম বাদ। ভারী পোষ্টাই হুজুর, সাত দিন খেলে লিকলিকে রোগা লোকেরও গায়ে গত্তি লেগে ভুঁড়ি গজায়।

—তুমি তো অনেক রকম জান দেখছি হে। আচ্ছা মুর্গ্ মুসল্লম তৈরি করতে পার?

—নিশ্চয় পারি হুজুর, ঘণ্টা তিনেক আগে অর্ডার দিতে হয়, অনেক লটখটি কিনা। বাবুর্চীদের চাইতে আমি ঢের ভাল বানাতে পারি, আমি নতুন কায়দা আবিষ্কার করেছি। একটি বড় আস্ত মুরগি, তার পেটের মধ্যে মাছের কোপ্তা, ডিম আর কুচো-চিংড়ি দেওয়া কচুর শাগের ঘণ্ট, অভাবে লাউ-চিংড়ি, আর দই—

—কচুর শাগ? আরে রাম রাম।

—না হুজুর, মুরগির পেটে সমস্ত জিনিস ভরে দিয়ে সেলাই করে হাঁড়ি-কাবাবের মত পাক করতে হয়, সুসিদ্ধ হয়ে গেলে মুরগি কুচো-চিংড়ি কচুর শাগ দই আর সমস্ত মশলা মিশে গিয়ে এক হয়ে যায়। খেতে যা হয় সে আর কি বলব হুজুর।

রাজাবাহাদুর এবারে আর সামলাতে পারলেন না, খানিকটা নাল টেবিলে পড়ে গেল। একটু লজ্জিত হয়ে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, ওহে রাইচরণ, উত্তম সর-ভাজা খাওয়াতে পার?

—হুজুরের আশীর্বাদে কি না পারি? সর-ভাজার রাজা হল গোলাপী গাইদুধের সর-ভাজা, নবাব সিরাজুদ্দৌলা যা

খেতেন। কিন্তু দশ দিন সময় চাই মহারাজ, আর শ-খানিক টাকা খরচা মঞ্জুর করতে হবে।

—গোলাপী রঙের গরু হয় নাকি ?

—না হুজুর। একটি ভাল গরুকে সাত দিন ধরে সেরেফ গোলাপ ফুল, গোলাব জল আর মিছরি খাওয়াতে হবে, খড় ভূষি জল একদম বারণ। তারপর সে যা দুধ দেবে তার রং হবে গোলাপী আর খোশবায় ভুর ভুর করবে। সেই দুধ ঘন করে তার সর নিতে হবে, আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি দিয়েই ভাজতে হবে। রসে ফেলবার দরকার নেই আপনিই মিষ্টি হবে—গরু মিছরি খেয়েছে কিনা। সে যা জিনিস, অমৃত কোথায় লাগে। কেষ্টনগরের কারিগররা তা দেখলে দুঃখে গলায় দড়ি দেবে।

—কিন্তু অত গোলাপ ফুল খেলে গরুর পেট ছেড়ে দেবে না ?

রাইচরণ গলার স্বর নীচু করে বললে, কথাটা কি জানেন মহারাজ ? গোলাপ ফুলের সঙ্গে খানিকটা সিদ্ধি-বাটাও খাওয়াতে হয়, তাতে গরুর পেট ঠিক থাকে আর সর-ভাজাটিও বেশ মজাদার হয়।

—চমৎকার, চমৎকার !

—এইবার হুজুর আজ্ঞা করুন কি কি খাবার আনব। আমি নিবেদন করছি কি—আজ আমার যা তৈরী আছে সবই কিছু কিছু খেয়ে দেখুন, ভাল জিনিস, নিশ্চয় আপনি খুশী হবেন। এর পরে একদিন অর্ডার মতন পছন্দসই জিনিস তৈরি করে হুজুরকে খাওয়াব।

—আচ্ছা রাইচরণ, তোমার এখানে পাতি নেবু আছে?

—আছে বই কি, নেবু হল পোলাও খাবার অঙ্গ। একটি আরজি আছে মহারাজ—আজ ভোজনের পর হুজুরকে একটি শরবত খাওয়াব, হুজুর তর্ হয়ে যাবেন।

—কিসের শরবত।

—তবে বলি শুনুন মহারাজ। আমার একটি দূর সম্পর্কের ভাগনে আছে, তার নাম কানাই। সে বিস্তর পাস করেছে, নানারকম দ্রব্যগুণ তার জানা আছে। শরবতটি সেই কানাই ছোকরার পেটেণ্ট, সে তার নাম দিয়েছে—চাঙ্গায়নী সুধা। বছর-দুই আগে কানাই হুণ্ডাগড় রাজসরকারে চাকরি করত, কুমার সায়েব তাকে খুব ভালবাসতেন। কুমারের খুব শিকারের শখ, একদিন তাঁর হাতিকে বাঘে ঘায়েল করলে। হাতির ঘা দিন-কুড়ির মধ্যে সেরে গেল, কিন্তু তার ভয় গেল না। হাতি নড়ে না, ডাঙশ মারলেও ওঠে না। কুমার সায়েবের হুকুম নিয়ে কানাই হাতিকে সের-টাক চাঙ্গায়নী খাওয়ালে। পরদিন ভোরবেলা হাতি চাঙ্গা হয়ে পিলখানা থেকে গটগট করে হেঁটে চলল, জঙ্গল থেকে একটা শালগাছের রলা উপড়ে নিলে, পাতাগুলো খেয়ে ফেলে ডাণ্ডা বানালে, তার পর পাহাড়ের ধারে গিয়ে শুঁড় দিয়ে সেই ডাণ্ডা ধরে বাঘটাকে দমাদম পিটিয়ে মেরে ফেললে। কুমার সায়েব খুশী হয়ে কানাইকে পাঁচশ টাকা বকশিশ দিলেন।

—শরবতে হুইস্কি টুইস্কি আছে নাকি? ওসব আমার আর চলে না।

—কি যে বলেন হুজুর। কানাই ওসব ছোঁয় না, অতি ভাল ছেলে, সিগারেটটি পর্যন্ত খায় না। চাঙ্গায়নী সুধায় কি কি আছে শুনবেন? কুড়িটা কবরেজী গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারী আরক, কুড়িদফা হেকিমী দাবাই, হীরেভস্ম, সোনাভস্ম, মুক্তোভস্ম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকটিরি—এইসব মিশিয়ে চোলাই করে তৈরী হয়। খুব দামী জিনিস, কানাই আমাকে হাফ প্রাইস পঞ্চাশ টাকায় এক বোতল দিয়েছে, মামা বলে ভক্তি করে কিনা। দোহাই হুজুর, আজ একটু খেয়ে দেখবেন।

—সে হবে এখন। আচ্ছা রাইচরণ, তুমি বার্লি রাখ?

—রাখি হুজুর। ছানার পুডিংএ দিতে হয়, নইলে আঁট হয় না। এইবার তবে হুজুরের জন্য খাবার আনতে বলি? হুকুম করুন কি কি আনব।

—এক কাজ কর—এক কাপ জলে এক চামচ বার্লি সিদ্ধ করে নেবু আর একটু নুন দিয়ে নিয়ে এস।

রাইচরণ আকাশ থেকে পড়ে বললে, সেকি মহারাজ! ভেটকি মাছের পোলাও, মটন-কারি, ফাউল-রোস্ট—

রাজাবাহাদুর হঠাৎ অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে বললেন, তুমি তো সাংঘাতিক লোক হ্যা! আমাকে মেরে ফেলতে চাও নাকি, অ্যাঁ? আমি বলে গিয়ে তিনটি বচ্ছর ডিসপেপসিয়ায় ভুগছি, কিচ্ছু হজম হয় না, সব বারণ, দিনে শুধু গলা ভাত আর শিঙি মাছের ঝোল, রাত্তিরে বার্লি—আর তুমি আমাকে পোলাও কালিয়ার লোভ দেখাচ্ছ! কি ভয়ানক খুনে লোক!

রাইচরণ মর্মাহত হয়ে চলে গেল এবং একটু পরে এক বাটি বার্লি এনে রাজাবাহাদুরের সামনে ঠক্ করে রেখে বললে, এই নিন।

তার পর রাইচরণ পর্দা ঠেলে পাশের কামরায় গিয়ে মহিলাটিকে বললে, রানী-মা, আপনার জন্য একটু ভেটকি মাছের পোলাও, মটম-কারি আর ফাউল রোস্ট আনি ?

—খেপেছেন ? আমি খাব আর ওই হ্যাংলা বুড়ো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে ! গলা দিয়ে নামবে কেন ?

—তবে একটু চা আর খানকতক চিংড়ি কাটলেট ? এনে দিই রানী-মা ?

—রানী-ফানি নই, আমি নক্ষত্র দেবী। আর একদিন আসব এখন, স্টুডিওর ফেরৎ। ডিরেক্টার হাঁদু বাবুকেও নিয়ে আসব।

১৩৫৫

পরশ পাথর

পরেশবাবু একটি পরশ পাথর পেয়েছেন। কবে পেয়েছেন, কোথায় পেয়েছেন, কেমন করে সেখানে এল, আরও পাওয়া যায় কিনা—এসব খোঁজে আপনাদের দরকার কি। যা বলছি শুনে যান।

পরেশবাবু মধ্যবিত্ত মধ্যবয়স্ক লোক, পৈতৃক বাড়িতে থাকেন, ওকালতি করেন। রোজগার বেশী নয়, কোনও রকমে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। একদিন আদালত থেকে বাড়ি ফেরবার পথে একটি পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে পেলেন। জিনিসটা কি তা অবশ্য তিনি চিনতে পারেন নি, একটু নূতন রকম পাথর দেখে রাস্তার এক পাশ থেকে তুলে নিয়ে পকেটে পুরলেন। বাড়ি এসে তাঁর অফিস-ঘরের তালা খোলবার জন্য পকেট থেকে চাবি বার করে দেখলেন তার রং হলদে। পরেশবাবু আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, ঘরের চাবি তো লোহার, পিতলের হল কি করে? হয়তো চাবিটা কোনও দিন হারিয়েছিল, গৃহিণী তাঁকে না জানিয়েই চাবিওয়ালা ডেকে এই পিতলের চাবিটা করিয়েছেন, এত দিন পরেশবাবুর নজরে পড়ে নি।

পরেশবাবু ঘরে ঢুকে মনিব্যাগ ছাড়া পকেটের সমস্ত জিনিস টেবিলের উপর ঢাললেন, তার পর দোতলায় উঠলেন। চাবির কথা তাঁর আর মনে রইল না। জলযোগ এবং ঘণ্টা

খানিক বিশ্রামের পর তিনি মকদ্দমার কাগজপত্র দেখবার জন্য আবার নীচের ঘরে এলেন এবং আলো জ্বাললেন। প্রথমেই পাথরটি নজরে পড়ল। বেশ গোলগাল চকচকে নুড়ি, কাল সকালে তাঁর ছোট খোকাকে দেবেন, সে গুলি খেলবে। পরেশবাবু তাঁর টেবিলের দেরাজ টেনে পাথরটি রাখলেন। তাতে ছুরি কাঁচি পেনসিল কাগজ খাম প্রভৃতি নানা জিনিস আছে। কি আশ্চর্য! ছুরি আর কাঁচি হলদে হয়ে গেল। পরেশবাবু পাথরটি নিয়ে তাঁর কাচের দোয়াতে ঠেকালেন, কিছুই হল না। তার পর একটা সীসের কাগজ-চাপায় ঠেকালেন, হলদে আর প্রায় ডবল ভারী হয়ে গেল। পরেশ-বাবু কাঁপা গলায় তাঁর চাকরকে ডেকে বললেন, হরিয়া, ওপর থেকে আমার ঘড়িটা চেয়ে নিয়ে আয়। হরিয়া ঘড়ি এনে দিয়ে চলে গেল। নিকেলের সস্তা হাত-ঘড়ি, তাতে চামড়ার ফিতে লাগানো। পাথর ছোঁয়ানো মাত্র ঘড়ি আর ফিতের বকলস সোনা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা বন্ধ হল, কারণ স্প্রিংও সোনা হয়ে গেছে, তার আর জোর নেই।

পরেশবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। ক্রমশ তাঁর জ্ঞান হল যে তিনি অতি দুর্লভ পরশ পাথর পেয়েছেন যা ছোঁয়ালে সব ধাতুই সোনা হয়ে যায়। তিনি হাত জোড় করে কপালে বার বার ঠেকাতে ঠেকাতে বললেন, জয় মা কালী, এত দয়া কেন মা? হরি, তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, একি লীলা খেলছ বাবা? স্বপ্ন দেখছি না তো? পরেশবাবু তাঁর বাঁ হাতে একটি প্রচণ্ড চিমটি কাটলেন, তবু ঘুম ভাঙল না, অতএব

স্বপ্ন নয়। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। শকুন্তলার মতন তিনি বুকে হাত দিয়ে বললেন, হৃদয় শান্ত হও; এখনই যদি ফেল কর তবে এই দেবতার দান কুবেরের ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে? পরেশবাবু শুনেছিলেন, এক ভদ্রলোক লটারিতে চার লাখ টাকা পেয়েছেন শুনে আহ্লাদে এমন লাফ মেরেছিলেন যে কড়িকাঠে লেগে তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল। পরেশবাবু নিজের মাথা দু হাত দিয়ে চেপে রাখলেন পাছে লাফ দিয়ে ফেলেন।

অত্যন্ত দুঃখের মতন আনন্দও কালক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরেশবাবু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হলেন এবং অতঃপর কি করবেন তা ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ জানাজানি হওয়া ভাল নয়, কোন শত্রু কি বাধা দেবে বলা যায় না। এখন শুধু তাঁর গৃহিণী গিরিবালাকে জানাবেন, কিন্তু মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। পরেশবাবু দোতলায় গিয়ে একটু একটু করে সইয়ে সইয়ে পত্নীকে তাঁর মহা সৌভাগ্যের খবর জানালেন এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্য দিয়ে বললেন, খবরদার, যেন জানাজানি না হয়।

গৃহিণীকে সাবধান করলেন বটে, কিন্তু পরেশবাবু নিজেই একটু অসামাল হয়ে পড়লেন। শোবার ঘরের একটা লোহার কড়িতে পরশ পাথর ঠেকালেন, কড়িটা সোনা হওয়ার ফলে নরম হল, ছাত বসে গেল। বাড়িতে ঘটি বাটি থালা বালতি যা ছিল সবই সোনা করে ফেললেন। লোকে দেখে আশ্চর্য

হয়ে ভাবতে লাগল, এসব জিনিস গিলটি করা হল কেন? ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। পরেশবাবু ধমক দিয়ে বললেন, যাও, যাও, বিরক্ত করো না, আমি যাই করি না কেন তোমাদের মাথাব্যথা কিসের? প্রশ্নের ঠেলায় অস্থির হয়ে পরেশবাবু লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিলেন, মক্কেলরা স্থির করলে যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

এর পর পরেশবাবু ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন, তাড়াতাড়ি করলে বিপদ হতে পারে। কিছু সোনা বেচে নোট পেয়ে ব্যাংকে জমা দিলেন, কম্পানির কাগজ আর নানারকম শেয়ারও কিনলেন। বালিগঞ্জে কুড়ি বিঘা জমির উপর প্রকাণ্ড বাড়ি আর কারখানা করলেন, ইট সিমেণ্ট লোহা কিছুরই অভাব হল না, কারণ, কর্তাদের বশ করা তাঁর পক্ষে অতি সহজ। এক জায়গায় রাশি রাশি মরচে পড়া মোটর-ভাঙা লোহার টুকরো পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কত দর? লোহার মালিক অতি নির্লোভ, বললে, জঞ্জাল তুলে নিয়ে যান বাবু, গাড়ি ভাড়াটা দিতে পারব না। পরেশবাবু রোজ দশ-বিশ মণ উঠিয়ে আনতে লাগলেন। খাস কামরায় লুকিয়ে পরশ পাথর ছোঁয়ান আর তৎক্ষণাৎ সোনা হয়ে যায়। দশ জন গুর্খা দারোয়ান আর পাঁচটা বুলডগ কারখানার ফটকে পাহারা দেয়, বিনা হুকুমে কেউ ঢুকতে পায় না।

সোনা তৈরী আর বিক্রি সব চেয়ে সোজা কারবার, কিন্তু রাশিপরিমাণে উৎপাদন করতে গেলে একলা পারা যায় না।

পরেশবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন এবং অনেক দরখাস্ত বাতিল করে সদ্য এম. এস-সি. পাস প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসকে দেড় শ টাকায় বাহাল করলেন। তার আত্মীয়-স্বজন বিশেষ কেউ নেই, সে পরেশবাবুর কারখানাতেই বাস করতে লাগল। প্রিয়তোষ প্রাতঃকৃত্য স্নান আহার ইত্যাদির জন্য দৈনিক এক ঘণ্টার বেশী সময় নেয় না, সাত ঘণ্টা ঘুময়, আট ঘণ্টা কারখানার কাজ করে, বাকী আট ঘণ্টা সে তার কলেজের সহপাঠিনী হিন্দোলা মজুমদারের উদ্দেশ্যে বড় বড় কবিতা আর প্রেমপত্র লেখে এবং হরদম চা আর সিগারেট খায়। অতি ভাল ছেলে, কারও সঙ্গে মেশে না, রবিবারে গির্জেতেও যায় না, কোনও বিষয়ে কৌতূহল নেই, কখনও জানতে চায় না এত সোনা আসে কোথা থেকে। পরেশবাবু মনে করেন, তিনি পরশ পাথর ছাড়া আর একটি রত্ন পেয়েছেন—এই প্রিয়তোষ ছোকরা। সে বৈদ্যুতিক হাপরে বড় বড় মুচিতে সোনা গলায় আর মোটা মোটা বাট বানায়। পরেশবাবু তা এক মারোয়াড়ী সিণ্ডিকেটকে বেচেন আর ব্যাংকের খাতায় তাঁর জমা অঙ্কের পর অঙ্ক বাড়তে থাকে। পরেশ গৃহিণীর এখন ঐশ্বর্যের সীমা নেই। গহনা পরে পরে তাঁর সর্বাঙ্গে বেদনা হয়েছে, সোনার উপর ঘেন্না ধরে গেছে, তিনি শুধু দু হাতে শাঁখা এবং গলায় রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে লাগলেন।

কিন্তু পরেশবাবুর কার্যকলাপ বেশী দিন চাপা রইল না। বাংলা সরকারের আদেশে পুলিশের লোক পিছনে লাগল। তারা

সহজেই বশে এল, কারণ রামরাজ্যের রীতিনীতি এখনও তাদের রপ্ত হয়নি, দশ-বিশ ভরি পেয়েই তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বিজ্ঞানীর দল আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নানারকম জল্পনা করতে লাগলেন। যদি তাঁরা দু শ বৎসর আগে জন্মাতেন তবে অনায়াসে বুঝে ফেলতেন যে পরেশবাবু পরশ পাথর পেয়েছেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে পরশ পাথরের স্থান নেই, অগত্যা তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে পরেশবাবু কোনও রকমে একটা পরমাণু ভাঙবার যন্ত্র খাড়া করেছেন এবং ভাঙা পরমাণুর টুকরো জুড়ে জুড়ে সোনা তৈরী করছেন, যেমন ছেঁড়া কাপড় থেকে কাঁথা তৈরি হয়। মুশকিল এই, যে পরেশবাবুকে চিঠি লিখলে উত্তর পাওয়া যায় না, আর প্রিয়তোষটা ইডিয়ট বললেই হয়, নিতান্ত পীড়াপীড়ি করলে বলে, আমি শুধু সোনা গলাই, কোথা থেকে আসে তা জানি না। বিদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথমে পরেশবাবুর ব্যাপার গুজব মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁরাও চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বিশেষজ্ঞদের উপদেশে ঘাবড়ে গিয়ে ভারত সরকার স্থির করলেন যে পরেশবাবু ডেঞ্জারস পার্সন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না, কারণ পরেশবাবু কোনও বেআইনী কাজ করছেন না। তাকে গ্রেফতার এবং তাঁর কারখানা ক্রোক করবার জন্য একটা অর্ডিনান্স জারির প্রস্তাবও উঠল, কিন্তু ক্ষমতাশালী দেশী বিদেশী লোকের আপত্তির জন্য তা হল না। ব্রিটেন ফ্রান্স আমেরিকা রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের

ভারতস্থ দূতরা পরেশবাবুর উপর কড়া সুনজর রাখেন, তাঁকে বার বার ডিনারের নিমন্ত্রণ করেন। পরেশবাবু চুপচাপ খেয়ে যান, মাঝে মাঝে ইয়েস-নো বলেন, কিন্তু তাঁর পেটের কথা কেউ বার করতে পারে না, শ্যাম্পেন খাইয়েও নয়। বাংলা দেশের কয়েক জন কংগ্রেসী নেতা তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন —রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আপনার রহস্য শুধু আমাদের কজনকে জানিয়ে দিন। কয়েক জন কমিউনিস্ট তাঁকে বলেছেন— খবরদার, কারও কথা শুনবেন না মশায়, যা করছেন করে যান, তাতেই জগতের মঙ্গল হবে।

আত্মীয় বন্ধু আর খোশামুদের দল ক্রমেই বাড়ছে, পরেশবাবু তাঁদের যথাযোগ্য পারিতোষিক দিচ্ছেন, তবু কেউ খুশী হচ্ছে না। শত্রুর দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করে আছে। ঐশ্বর্যবৃদ্ধি হলেও পরেশবাবু তাঁর চাল বেশী বাড়ান নি, তাঁর গৃহিণীও সেকেলে নারী, টাকা ওড়াবার কায়দা জানেন না। তথাপি পরেশবাবুর নাম এখন ভুবন-বিখ্যাত, তিনি নাকি চারটে নিজামকে পুষতে পারেন। তিনি কি খান কি পরেন কি বলেন তা ইউরোপ আমেরিকার সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হয়। সম্প্রতি দেশবিদেশ থেকে প্রেমপত্র আসতে আরম্ভ করেছে। সুন্দরীরা নিজের নিজের ছবি পাঠিয়ে আর গুণবর্ণনা করে লিখছেন, ডিয়ারেস্ট সার, আপনার পুরাতন পত্নীটি থাকুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। আপনি তো উদারপ্রকৃতি হিন্দু, আমাকে শুদ্ধি করে আপনার হারেমে ভরতি করুন, নয়তো বিষ খাব। এই রকম

চিঠি প্রত্যহ রাশি রাশি আসছে আর গিরিবালা ছোঁ মেরে কেড়ে নিচ্ছেন। তিনি একটি মেম সেক্রেটারি রেখেছেন। সে প্রত্যেক চিঠির তরজমা শোনায় এবং গিরিবালার আজ্ঞায় জবাব লেখে। গিরিবালা রাগের বশে অনেক কড়া কথা বলে যান, কিন্তু মেমের বিদ্যা কম, শুধু একটি কথা লেখে—ড্যাম, অর্থাৎ দূর মুখপুড়ী, গলায় দেবার দড়ি জোটে না তোর? ইউরোপের দশজন নামজাদা বিজ্ঞানী চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে পরেশবাবু যদি সোনার রহস্য প্রকাশ করেন তবে তাঁরা চেষ্টা করবেন যাতে তিনি রসায়ন পদার্থবিদ্যা আর শান্তি এই তিনটি বিষয়ের জন্য নোবেল প্রাইজ এক সঙ্গেই পান। এ চিঠিও পরেশ-গৃহিণী প্রেমপত্র মনে করে মেমের মারফত জবাব দিয়েছেন—ড্যাম।

পরেশবাবু সোনার দর ক্রমেই কমাচ্ছেন, বাজারে একশ পনের টাকা ভরি থেকে সাত টাকা দশ আনায় নেমেছে। ব্রিটিশ সরকার সস্তায় সোনা কিনে আমেরিকার ডলার-লোন শোধ করেছেন। আমেরিকা খুব রেগে গেছে, কিন্তু আপত্তি করবার যুক্তি স্থির করতে পারছে না। ভারতে স্টারলিং ব্যালান্সও ব্রিটেন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু এদেশের প্রধান মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন—আমরা তোমাদের সোনা ধার দিই নি, ডলারও দিই নি; যুদ্ধের সময় জিনিস সরবরাহ করেছি, সেই দেনা জিনিস দিয়েই তোমাদের শুধতে হবে।

অর্থনীতি আর রাজনীতির ধুরন্ধরগণ ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছেন, কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না। যদি এটা সত্য ত্রেতা বা দ্বাপর যুগ হত তবে তাঁরা তপস্যা করে ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহেশ্বরের সাহায্যে পরেশবাবুকে জব্দ করে দিতেন। কিন্তু এখন তা হবার জো নেই। কোনও কোনও পণ্ডিত বলছেন, প্লাটিনম আর রূপো চালাও। অন্য পণ্ডিত বলছেন, উঁহু, তাও হয়তো সস্তায় তৈরি হবে, রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ম স্ট্যানডার্ড করা হক, কিংবা প্রাচীন কালের মতন বিনিময় প্রথায় লেন-দেন চলুক।

চার্চিলকে আর সামলানো যাচ্ছে না, তিনি খেপে গিয়ে বলছেন, আমরা কমনওয়েল্‌থের সর্বনাশ হতে দেব না, ইউ-এন-ওর কাছে নালিশ করে সময় নষ্টও করব না। ভারতে আবার ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হক, আমাদের ফৌজ গিয়ে ওই পরেশটাকে ধরে আনুক, আইল-অভ-ওয়াইটে ওকে নজরবন্দী করে রাখা হক। সেখানে সে যত পারে সোনা তৈরী করুক, কিন্তু সে সোনা এম্পায়ার-সোনা, ব্রিটিশ রাষ্ট্র-সংঘের সম্পত্তি, আমরাই তার বিলি করব।

বার্নার্ড শ বলেছেন, সোনা একটা অকেজো ধাতু, তাতে লাঙল কাস্তে কুড়ুল বয়লার এঞ্জিন কিছুই হয় না। পরেশ-বাবু সোনার মিথ্যা প্রতিপত্তি নষ্ট করে ভাল করেছেন। এখন তিনি চেষ্টা করুন যাতে সোনাকে ইস্পাতের মতন শক্ত করা যায়। সোনার ক্ষুর পেলেই আমি দাড়ি কামাব।

রাশিয়ার এক মুখপাত্র পরেশবাবুকে লিখেছেন, মহাশয়,

আপনাকে পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করছি, আমাদের দেশে এসে বাস করুন, খাসা জায়গা। এখানে সাদায় কালোয় ভেদ নেই, আপনাকে মাথার মণি করে রাখব। দৈবক্রমে আপনি আশ্চর্য শক্তি পেয়েছেন, কিন্তু মাপ করবেন, আপনার বুদ্ধি তেমন নেই। আপনি সোনা করতেই জানেন, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার জানেন না। আমরা আপনাকে শিখিয়ে দেব। যদি আপনার রাজনীতিক উচ্চাশা থাকে তবে আপনাকে সোভিয়েট রাষ্ট্র-মণ্ডলের সভাপতি করা হবে। মস্কো শহরে এক শ একার জমির উপর একটি সুন্দর প্রাসাদ আপনার বাসের জন্য দেব। আর যদি নিরিবিলি চান তবে সাইবিরিয়ায় থাকবেন, একটি আস্ত নগর আপনাকে দেব। চমৎকার দেশ, আপনাদের শাস্ত্রে যার নাম উত্তরকুরু। এই চিঠিও গিরিবালা প্রেমপত্র ধ'রে নিয়ে জবাব দিয়েছেন—ড্যাম।

পরেশবাবু সোনার দাম ক্রমশ খুব কমিয়েছেন, এখন সাড়ে চার আনা ভরি। সমস্ত পৃথিবীতে খনিজ সোনা প্রতি বৎসরে আন্দাজ বিশ হাজার মণ উৎপন্ন হয়, এখন পরেশ-বাবু একাই বৎসরে লাখ মণ ছাড়ছেন। গোল্ড স্ট্যানডার্ড অধঃপাতে গেছে। সব দেশেই ভীষণ ইনফ্লেশন, নোট আর ধাতুমুদ্রা খোলাম কুচির সমান হয়েছে। মজুরি আর মাইনে বহু গুণ বাড়িয়েও লোকের দুর্দশা ঘুচছে না। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য, চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেছে।

ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ জন অনশনব্রতী মৃত্যুপণ করে

পরেশবাবুর ফটকের সামনে শুয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি বেনামা চিঠি পাচ্ছেন—তুমি জগতের শত্রু, তোমাকে খুন করব। পরেশবাবুরও ঐশ্বর্যে অরুচি ধরে গেছে। গিরিবালা কান্নাকাটি আরম্ভ করেছেন, কেবলই বলছেন, যদি শান্তিতে থাকতে না পারি তবে ধনদৌলত নিয়ে কি হবে। সর্বনেশে পাথরটাকে বিদায় কর, সব সোনা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে কাশীবাস করবে চল।

পরেশবাবু মনস্থির ক'রে ফেললেন। সকালবেলা প্রিয়তোষকে সোনা তৈরির রহস্য জানিয়ে দিলেন।

প্রিয়তোষ নির্বিকার। পরেশবাবু তাকে পরশপাথরটা দিয়ে বললেন, এটাকে আজই ধ্বংস ক'রে ফেল, পুড়িয়ে, অ্যাসিডে গলিয়ে, অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে পার। প্রিয়তোষ বললে, রাইট-ও।

বিকালবেলা একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে পরেশবাবুকে বললে, জলদি আসুন হুজুর, বিসোআস সাহেব পাগলা হয়ে গেছেন, আপনাকে ডাকছেন। পরেশবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলেন, প্রিয়তোষ তার শোবার ঘরে খাটিয়ায় শুয়ে কাঁদছে। পরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? প্রিয়তোষ উত্তর দিলে, এই চিঠিটা পড়ে দেখুন সার। পরেশবাবু পড়লেন—

প্রিয় হে প্রিয়, বিদায়। বাবা রাজী নন, তাঁর নানা রকম আপত্তি। তোমার চাল-চুলো নেই, পরের বাড়ীতে থাক, মোটে দেড় শ টাকা মাইনে পাও, তার ওপর আবার জাতে খ্রীষ্টান,

আবার আমার চাইতে বয়সে এক বৎসরের ছোট। বললেন, বিয়ে হতেই পারে না। আর একটি খবর শোন। গুঞ্জন ঘোষের নাম শুনেছ? চমৎকার গায়, সুন্দর চেহারা, কোঁকড়া চুল। সিভিল সাপ্লাইএ ছ শ টাকা মাইনে পায়, বাপের এক-মাত্র ছেলে, বাপ কনট্রাকটারি করে নাকি কোটি টাকা করেছে। সেই গুঞ্জনের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দুঃখ করো না, লক্ষ্মীটি। বকুল মল্লিককে চেন তো? আমার চেয়ে তিন বছরের জুনিয়ার, ডায়োসিসানে এক সঙ্গে পড়েছি। আমার কাছে দাঁড়াতে পারে না, তা হক, অমন মেয়ে হাজারে একটি পাবে না। বকুলকে বাগাও, তুমি সুখী হবে। প্রিয় ডারলিং, এই আমার শেষ প্রেমপত্র, কাল থেকে তুমি আমার ভাই, আমি তোমার স্নেহময়ী দিদি। ইতি। আজ পর্যন্ত তোমারই—হিন্দোলা।

চিঠি পড়ে পরেশবাবু বললেন, তুমি তো আচ্ছা বোকা হে! হিন্দোলা নিজেই সরে পড়ছে, এ তো অতি সুখবর, এতে দুঃখ কিসের? তোমার আবার কালীঘাটে পূজো দেওয়া চলবে না, না হয় গির্জেয় দুটো মোমবাতি জ্বেলে দিও। নাও এখন ওঠ, চোখে মুখে জল দাও, চা আর খানকতক লুচি খাবে এস। হাঁ, ভাল কথা—পাথরটার কোনও গতি করতে পারলে?

প্রিয়তোষ করুণ স্বরে বললে, গিলে ফেলেছি সার। এ প্রাণ আর রাখব না, আপনার পাথর আমার সঙ্গেই [illegible] যাবে। ওঃ, এত দিনের ভালবাসার পর এখন কিনা [illegible] ঘোষ!

পরেশবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, পাথরটা গিললে কেন? বিষ নাকি?

প্রিয়তোষ বললে, কম্পোজিশন তো জানা নেই সার, কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা বিষ। যদি বিষ নাও হয়, যদি আজ রাত্রির মধ্যে না মরি, তবে কাল সকালে নিশ্চয় দশ গ্রাম পটাশ সায়ানাইড খাব, আমি ওজন করে রেখেছি। আপনি ভাববেন না সার, আপনার পাথর আমার সঙ্গেই কবরস্থ হয়ে থাকবে, সেই ডে অভ জজমেণ্ট পর্যন্ত।

পরেশবাবু বললেন, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। ওসব বদখেয়াল ছাড়, আমি চেষ্টা করব যাতে হিন্দোলার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। ওর বাপ জগাই মজুমদার আমার বাল্য-বন্ধু, ঘুঘু লোক। তোমাকে আমি ভাল রকম যৌতুক দেব, তা শুনলে হয়তো সে মেয়ে দিতে রাজী হবে। কিন্তু তুমি যে খ্রীষ্টান—

—হিঁদু হব সার।

—একেই বলে প্রেম। এখন ওঠ, ডাক্তার চ্যাটার্জির কাছে চল, পাথরটাকে তো পেট থেকে বার করতে হবে।

পরেশবাবু জানালেন যে প্রিয়তোষ অন্যমনস্ক হয়ে একটা পাথরের নুড়ি গিলে ফেলেছে। ডাক্তারের উপদেশে পরদিন এক্স রে ফোটো নেওয়া হল। তা দেখে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, এমন কেস দেখা যায় না, কালই আমি লানসেটে রিপোর্ট পাঠাব। এই ছোকরার অ্যাসেণ্ডিং কোলনের পাশে

থেকে ছোট্ট একটি সেমিকোলন বেরিয়েছে, তার মধ্যে পাথরটা আটকে আছে। হয়তো আপনিই নেমে যাবে। এখন যেমন আছে থাকুক, বিশেষ কোনও ক্ষতি হবে না। যদি খারাপ লক্ষণ দেখা দেয় তবে পেট চিরে বার করে দেব।

পরেশবাবুর চিঠি পেয়ে জগাই মজুমদার তাড়াতাড়ি দেখা করতে এলেন এবং কথাবার্তার পর ছুটে গিয়ে তাঁর মেয়েকে বললেন, ওরে দোলা, প্রিয়তোষ হিন্দু হতে রাজী হয়েছে, তাকেই বিয়ে কর্। দেরি নয়, ওর শুদ্ধিটা আজই হয়ে যাক, কাল বিয়ে হবে।

হিন্দোলা আকাশ থেকে পড়ে বললে, কি তুমি বলছ বাবা! এই পরশু বললে গুঞ্জন ঘোষ, আবার আজ বলছ প্রিয়তোষ! এই দেখ, গুঞ্জন আমাকে কেমন হীরের আংটি দিয়েছে। বেচারা মনে করবে কি? তুমি তাকে কথা দিয়েছ, আমিও দিয়েছি, তার খেলাপ হতে পারে না। গুঞ্জনের কাছে কি প্রিয়তোষ? কিসে আর কিসে!

জগাইবাবু বললেন, যা যাঃ, তুই তো সব বুঝিস্। প্রিয়তোষ এখন হিরণ্যগর্ভ হয়েছে, তার পেটে সোনার খনি। যবে হক্ একদিন বেরুবেই, তখন সেই পরশ পাথর তোরই হাতে আসবে। পরেশবাবু সেটা আর নেবেন না, প্রিয়তোষকে যৌতুক দিয়েছেন। ফেরত দে ওই হীরের আংটি, অমন হাজারটা আংটি প্রিয়তোষ তোকে দিতে পারবে। এমন সুপাত্রের কাছে

কোথায় লাগে তোর গুঁজে ঘোষ আর তার কনট্রাকটার বাপ? আর কথাটি নয়, প্রিয়তোষকেই বিয়ে কর্।

অশ্রুগদ্‌গদকণ্ঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হিন্দোলা বললে, তাকেই তো ভাল বাসতুম? কিন্তু বড্ড যে বোকা!

জগাইবাবু বললেন, আরে বোকা না হলে তোকে বিয়ে করতে চাইবে কেন? যার পেটে পরশ পাথর সে তো ইচ্ছে করলেই পৃথিবীর সেরা সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারে।

প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসের মনে বিন্দুমাত্র অভিমান নেই। তার শুদ্ধি হল, এক সের ভেজিটেব্‌ল ঘি দিয়ে হোম হল, পাঁচ জন ব্রাহ্মণ লুচি-ছোঁকা-দই-বোঁদে খেলে। তার পর শুভলগ্নে হিন্দোলা-প্রিয়তোষের বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু জগাইবাবু আর তাঁর কন্যার মনস্কামনা পূর্ণ হল না, পাথরটা নামল না। কিছুদিন পরে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল—পরেশবাবুর তৈরী সমস্ত সোনার জেল্লা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল, মাস খানিক পরে যেখানে যত ছিল সবই লোহা হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা খুব সোজা। সকলেই জানে যে ব্যর্থ প্রেমে স্বাস্থ্য যেমন বিগড়ে যায়, তৃপ্ত প্রেমে তেমনি চাঙ্গা হয়, দেহের সমস্ত যন্ত্র চটপট কাজ করে, অর্থাৎ মেটাবলিজম বেড়ে যায়। প্রিয়তোষ এক মাসের মধ্যে পরশ পাথর জীর্ণ করে ফেলেছে, এক্স রে-তে তার কণামাত্র দেখা যায় না। পাথরের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে পরেশবাবুর সমস্ত সোনা পূর্বরূপ পেয়েছে।

হিন্দোলা আর তার বাবা ভীষণ চটে গেছেন। বলছেন, প্রিয়তোষটা মিথ্যাবাদী ঠক জোয়াচ্চোর। ধাপ্পায় বিশ্বাস করে তাঁরা আশায় আশায় এত দিন বৃথাই ওই খ্রীষ্টানটার ময়লা ঘেঁটেছেন। কিন্তু পরশ পাথর হজম করে প্রিয়তোষ মনে বল পেয়েছে, তার বুদ্ধিও বেড়ে গেছে, পত্নী আর শ্বশুরের বাক্যবাণ সে মোটেই গ্রাহ্য করে না। এমন কি হিন্দোলা যদি বলে, তোমাকে তালাক দেব, তবু সে সায়ানাইড খাবে না। সে বুঝেছে যে সেণ্ট ফ্রানসিস আর পরমহংস দেব খাঁটি কথা বলে গেছেন, কামিনী আর কাঞ্চন দুইই রাবিশ; লোহার তুল্য কিছু নেই। এখন সে পরেশবাবুর নূতন লোহার কারখানা চালাচ্ছে, রোজ পঞ্চাশ টন নানা রকম মাল ঢালাই করছে, এবং বেশ ফুর্তিতে আছে।

১৩৫৫

রামরাজ্য

জেলা জজ সুবোধ রায় সম্প্রতি অবসর নিয়ে কলকাতায় বাস করছেন। তিনি এখন গীতা পড়েন, সস্ত্রীক ঘন ঘন সিনেমা দেখেন, বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খেলেন এবং রাজনীতি নিয়ে তর্ক করেন। তাঁর আর একটা শখ আছে—প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে একটি সেয়াঁস বা প্রেতচক্রের অধিবেশন হয়। এই চক্রের সদস্য সাত জন, যথা—

সুবোধ রায় নিজে,
বিপাশা দেবী—তাঁর পত্নী,
হরিপদ কবিরত্ন—অধ্যাপক,
কানাই গাঙ্গুলী—প্রবীণ দেশপ্রেমী,
ভুজঙ্গ ভঞ্জ—নবীন দেশপ্রেমী,
অবধবিহারী লাল—কারবারী দেশপ্রেমী,
ভূতনাথ নন্দী—বিখ্যাত মিডিয়ম।

ভূতনাথ গুণী লোক। তিন মিনিট আবাহন করতে না করতে তার উপর পরলোকবাসীর ভর হয় এবং তার মুখ দিয়ে অনর্গল অলৌকিক বাণী বেরুতে থাকে। ভূতনাথের বয়স ত্রিশের মধ্যে। শোনা যায় পূর্বে সে স্কুলমাস্টার ছিল, তার পর গল্প নাটক ও কবিতা লিখত, তারপর থিয়েটার সিনেমায় অভিনয় করত। এক কালে তার একটা কুস্তির আখড়াও ছিল। সম্প্রতি নিজের আশ্চর্য ক্ষমতা আবিষ্কার করে সে

পেশাদার মিডিয়ম হয়েছে, সুবোধবাবু তার একজন বড় মক্কেল।

প্রেতচক্রের মামুলি পদ্ধতি হচ্ছে—অন্ধকার ঘরে সদস্যগণ টেবিলের চারিধারে বসেন এবং সকলে হাত ধরাধরি করে কোনও পরলোকবাসীকে একমনে ডাকেন। কিন্তু সুবোধবাবু খুঁতখুঁতে লোক। অন্ধকারে অন্য পুরুষ—বিশেষ করে ওই ভুজঙ্গ ছোকরা—তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হাত ধরে থাকবে, এ তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। ভাগ্যক্রমে ভূতনাথকে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। লোকটির আশ্চর্য ক্ষমতা, প্রেতাত্মার দল যেন তার পোষ-মানা। সে যেখানে মিডিয়ম হয় সেখানে হাত ধরার দরকার হয় না, অন্ধকার না হলেও চলে। এমন কি, প্রেতাত্মার কথার ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে গল্প করা চলে, চা সিগারেট পান খেতেও বাধা নেই।

আজ শনিবার সন্ধ্যাবেলায় নীচের বড় ঘরে যথারীতি প্রেত-চক্রের বৈঠক বসেছে, সকল সদস্যই উপস্থিত আছেন। ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সব দরজা জানালা বন্ধ, পাছে কোনও উটকো লোক এসে বিঘ্ন ঘটায়।

পূর্বে কয়েকটি অধিবেশনে চন্দ্রগুপ্ত সিরাজুদ্দৌলা নেপোলিয়ন হিটলার প্রভৃতি নামজাদা লোক এবং পরলোক-গত অনেক আত্মীয় স্বজন ভূতনাথের মারফত তাঁদের বাণী বলেছেন। সুবোধবাবু প্রশ্ন করলেন, আজ কাকে ডাকা হবে?

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বললে, আমার দাদামশাইকে একবার ডাকুন। তাঁর ভিক্টোরিয়া মার্কা গিনিগুলো কোথায় রেখে গেছেন খুঁজে পাচ্ছি না।

অবধবিহারী লাল বললে, দাদা চাচা মামু মৌসা উ সব ছোড়িয়ে দেন, মহাৎমাজিকো বোলান। দেখছেন তো, দেশ জহান্নমে যাচ্ছে, তিনি একটা সলাহ্ দেন জৈসে তুরন্ত্ রামরাজ্য্ হইয়ে যায়।

কানাই গাঙ্গুলী বললে, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন, ঢের করে গেছেন এখন বিশ্রাম করুন।

ভুজঙ্গ ভঞ্জ বললে, মহাত্মাজীকে ডেকে লাভ নেই, তিনি কি বলবেন তা তো জানাই আছে।—চরকা চালাও, মাইনে কম নাও, হুইস্কি ছাড়, বান্ধবীদের তাড়াও, ব্রহ্মচর্য পালন কর। এসব শুনতে গেলে কি রাজ্য চালানো যায়! কি বলেন কানাই-দা?

বিপাশা দেবী বললেন, আচ্ছা, মহাত্মাজীর যিনি ইষ্টদেব সেই রামচন্দ্রকে ডাকলে হয় না?

অবধবিহারী। বহুত আচ্ছি বাত বোলিয়েছেন, রাম-চন্দ্রজীকোই বোলান।

সুবোধ। সেই ভাল, রামরাজ্যের ফার্স্ট্‌হ্যাণ্ড খবর মিলবে।

ভুজঙ্গ। তাঁকে কোথায় পাবেন? তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা তারই ঠিক নেই। ভূতনাথবাবু কি বলেন?

ভূতনাথ। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

বিপাশা দেবীর প্রস্তাব সোৎসাহে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। তখন সকলে গুনগুন করে 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' গাইতে লাগলেন। দু মিনিট পরে ভূতনাথ চোখ কপালে তুলে মুখ উঁচু করে চেয়ারে হেলে পড়ল এবং অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল। সুবোধবাবু সসম্ভ্রমে বললেন, কনট্রোল এসে গেছেন, —অর্থাৎ মিডিয়মের উপর অশরীরী আত্মার আবেশ হয়েছে। অবধবিহারী বলে উঠল, রাজা রামচন্দ্রজীকি জয়!

ভূতনাথের মুখ থেকে শব্দ হল—খ্যাঁক খ্যাঁক। সুবোধবাবু বললেন, কে আপনি প্রভু?

অবধবিহারী। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীমে পুছিয়ে, রামচন্দ্রজী বাংলা সমঝেন না। অপ কৌন হৈঁ মহারাজ?

আবার খ্যাঁক খ্যাঁক। কবিরত্ন হাতজোড় করে সবিনয়ে বললেন, প্রভু, যদি আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে তো মার্জনা করুন। কৃপাপূর্বক বলুন কে আপনি।

ভূতনাথের মুখ থেকে উত্তর বেরুল—অহম্মারুতিঃ।

অবধবিহারী। আরে, ই তো চীনা বোলি বোলছে!

কবিরত্ন। চীনা নয়, দেবভাষায় বলছেন—আমি মারুতি। স্বয়ং পবননন্দন শ্রীহনুমানের আবির্ভাব হয়েছে।

অবধবিহারী। জয় বজরঙ্গ্‌বলী মহাবীরজী!—

রাম কাজ লগি তব অবতারা।
কনক বরন তন পর্বতাকারা॥

প্রভু, অপ হিন্দীমে কহিয়ে, রামরাজ্যকি ভাষা।

ভূতনাথের জবানিতে মহাবীর আর একবার সজোরে খ্যাঁক

করে উঠলেন, তার পর বললেন, রামরাজ্যের ভাষা তুমি কি জান হে? এখন গন্ধমাদনে থাকি, কিন্তু আমার আদি নিবাস কিষ্কিন্ধ্যা, মাইসোরের কাছে বেলারি জেলায়। আমার মাতৃভাষাই জগতের আদি ও বুনিয়াদি ভাষা। যদি সে ভাষায় কথা বলি তবে তোমাদের রাজাজী আর পট্টভিজী হয়তো একটু আধটু বুঝবেন, কিন্তু জহরলালজী রাজেন্দ্রজী আর তোমরা বিন্দুবিসর্গও বুঝবে না।

বিপাশা। যাক যাক। আপনি যখন বাংলা জানেন তখন বাংলাতেই বলুন।

মহাবীর। কিরকম বাংলা? ঢাকাই, না মানভূমের, না বাগবাজারী, না বালিগঞ্জী?

বিপাশা। আপনি মাঝামাঝি ভবানীপুরী বাংলায় বলুন, তা হলে আমরা সবাই বুঝতে পারব।

কবিরত্ন। প্রভু মারুতি, আপনার আগমনে আমরা ধন্য হয়েছি, কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এলেন না কেন?

মহাবীর। তাঁর আসতে বয়ে গেছে। তোমাদের কি-এমন পুণ্য আছে যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাও? তাঁর আজ্ঞায় আমি এসেছি। এখন কি জানতে চাও চটপট বলে ফেল, আমার সময় বড় কম।

সুবোধ। শুনুন মহাবীরজী। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু আর কিছুই পাই নি।—

কবিরত্ন। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই, ধর্ম নেই, সত্য নেই, ত্যাগ নেই, বিনয় নেই, তপস্যা নেই—

অবধবিহারী। বিলকুল চোর, ডাকু, লুটেরা, কালাবাজারুয়া, গাঁট-কটৈয়া—

ভুজঙ্গ। পুঁজিপতির অত্যাচার, সর্বহারার আর্তনাদ, জুলুম, ফাসিজ্‌ম, ধাপ্পাবাজি, কথার তুবড়ি, ভাইপো-ভাগনে-শালা-শালী-পিসতুতো-মাসতুতো-ভরণতন্ত্র—

কানাই। বিদেশী গুরুর প্ররোচনায় স্বদেশদ্রোহিতা, ভারতের আদর্শ বিসর্জন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যার প্রচার, কিষান-মজদুরকে কুমন্ত্রণা, বোকা ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়া, পিস্তল, বোমা—

মহাবীর। থাম থাম। কি চাও তাই বল।

অবধবিহারী। হামি বোলছি, শুনেন মহাবীরজী।—চারো তরফ ঘুস-খবৈয়া, সব মুনাফা ছিনিয়ে লিচ্ছে। বড় কষ্টে রহেছি, যেন দাঁতের মাঝে জিভ। বিভীখনজী জৈসা বোলিয়েছেন—

স্থনহু পবনস্থত রহনি হমারী।
জিমি দসনন্‌হি মহু জীব বিচারী॥

প্রভু, এক মুক্কা মার কে ইয়ে সব দাঁত তোড়িয়ে দেন।

কবিরত্ন। তুমি একটু চুপ কর তো বাপু। মহাবীরজী, আমরা কেবল রামরাজ্য চাই, তা হলেই সব হবে। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ, প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

কানাই। পণ্ডিত মশাই, ব্যস্ত হলে চলবে না, রাষ্ট্র-শাসনের ভার কদিনই বা আমরা পেয়েছি। মহাবীরজীর কৃপায়

যদি দেশবিদ্রোহীদের জব্দ করতে পারি তবে দেখবেন শীঘ্রই কিষান-মজত্নুর-রাজ হবে।

কবিরত্ন। কিষান-মজত্নুর সেক্রেটেরিয়েটে বসে রাজকার্য চালাবে?

ভুজঙ্গ। শোনেন কেন ওসব কথা, শুধু ভোট বজায় রাখবার জন্য ধাপ্পাবাজি।

কানাই। ভাই হে, ধাপ্পাবাজির ওস্তাদ তো তোমরা, তোমাদেরই গুটিকতক বুলি আমরা শিখেছি।

সুবোধ। থাম, এখন ঝগড়া করো না। মহাবীরজী, দলাদলিতে দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে, আপনি প্রতিকারের একটা উপায় বলুন। আমরা চাই বিশুদ্ধ ডিমোক্রাসি অর্থাৎ গণতন্ত্র, কিন্তু নানা দলের নানা কথা শুনে লোকে ঘাবড়ে যাচ্ছে, ডিমোক্রাসি দানা বাঁধতে পাচ্ছে না।

মহাবীর। একটি প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন।—

গোনর্দ দেশের রাজা গোবর্ধনের একলক্ষ গরু ছিল, তারা রাজধানীর নিকটস্থ অরণ্যে চরে বেড়াত, জনকতক গোপ তাদের পালন করত। কি একটা মহাপাপের জন্য অগস্ত্য মুনি শাপ দেন, তার ফলে রাজা এবং বিস্তর প্রজার মৃত্যু হল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল। রাজার গরুর পাল রক্ষকের অভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণে বিনিষ্ট হতে লাগল। তখন একটি বিজ্ঞ বৃষ বললে, এরকম অরাজক অবস্থায় তো আমরা বাঁচতে পারব না, ওই পর্বতের গুহায় পশুরাজ সিংহ থাকেন, চল আমরা তাঁর শরণাপন্ন হই। গরুদের

প্রার্থনা শুনে সিংহ বললে, উত্তম প্রস্তাব, আমি তোমাদের রাজা হলুম, তোমাদের রক্ষাও করব। কিন্তু আমাকেও তো জীবন-ধারণ করতে হবে, অতএব তোমরা রাজকর স্বরূপ প্রত্যহ একটি নধর গরু আমাকে পাঠাবে। গরুর দল রাজী হয়ে প্রণাম করে চলে গেল এবং সিংহকে রাজকর দিতে লাগল। কিছুকাল পরে সিংহ মাতব্বর গরুদের ডেকে আনিয়ে বললে, দেখ, একটি গরুতে আর কুলচ্ছে না, রাজ্যশাসনের জন্য অনেক অমাত্য পাত্র মিত্র বাহাল করতে হয়েছে। আমিও সংসারী লোক, পুত্রকন্যা ক্রমেই বাড়ছে, তাদের তো খাওয়াতে হবে। অতএব রাজকর বাড়াতে হচ্ছে, এখন থেকে তোমরা প্রত্যহ দশটি গরু পাঠাও। গরুরা বিষণ্ণ হয়ে যে আজ্ঞে বলে চলে গেল। আরও কিছুকাল পরে সিংহ বললে, ওহে প্রজাবৃন্দ, দশটি গরুতে আর চলে না, রাজ্যশাসন সোজা কাজ নয়। আর তোমরাও অতি বেয়াড়া প্রজা, তোমাদের দমনের জন্য বিস্তর কর্মচারী রাখতে হয়েছে। অতএব এখন থেকে প্রতিদিন কুড়িটি করে গরু পাঠাও। গরুর মুখপাত্ররা উপায়ান্তর না দেখে এবারেও বললে, যে আজ্ঞা মহারাজ; তার পর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। তখন সেই বিজ্ঞ বৃষ বললে, এই অরণ্যের উত্তর প্রান্তে এক মহাস্থবির তপস্বী বৃষ আছেন। পূর্বজন্মে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, অখাদ্য ভোজনের ফলে বৃষত্ব পেয়েছেন। এখন তিনি তপস্যা করে গবর্ষি হয়েছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, চল তাঁকে আমাদের দুঃখ জানাই। গরুরা গবর্ষির আশ্রমে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা বললে। কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ থেকে

গবর্ষি বললেন, আমি তোমাদের একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, এটি তোমরা নিরন্তর জপ কর—গোহিতায় গোভির্গবাং শাসনম্।

বিপাশা। মানে কি হল ?

কবিরত্ন। অর্থাৎ গরুর হিতের নিমিত্ত গরু কর্তৃক গরু শাসন।

বিপাশা। আশ্চর্য! ঠিক যেন government of the people, by the people, for the people.

মহাবীর। তার পর শোন। গবর্ষি বললেন, এই মন্ত্রটি তোমরা সর্বত্র প্রচার করবে, এক মাস পরে আবার আমার কাছে আসবে। গরুর দল মন্ত্র পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেল এবং এক মাস পরে আবার এল। গবর্ষি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের সংখ্যা কত ? গরুরা বললে, প্রায় এক লক্ষ ; সিংহ অনেককে খেয়েছে, নয়তো আরও বেশী হত। গবর্ষি বললেন, সিংহ আর তার অনুচরবর্গের সংখ্যা কত ? গরুরা বললে, শ-খানিক হবে। গবর্ষি বললেন, মন্ত্র জপ করে তোমাদের তেজ বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন এক কাজ কর—সকলে মিলে শিং উঁচিয়ে চারিদিক থেকে তেড়ে গিয়ে সিংহদের গুঁতিয়ে দাও। গরুর দল মহা উৎসাহে সিংহদের আক্রমণ করলে, গোটাকতক গরু মরল, কিন্তু সিংহের দল একেবারে ধ্বংস হল।

বিপাশা। কিন্তু আবার তো অরাজক হল ?

মহাবীর। উঁহু। গরুরা গণতন্ত্রের মন্ত্র শিখেছে, তারা নিজেদের মধ্য থেকে কয়েকটি চালাক উদ্যমশীল গরু নির্বাচন

করে তাদের উপর প্রজাশাসনের ভার দিলে। কিছুকাল পরে দেখা গেল, সেই শাসক-গরুদের খাড়া খাড়া গোঁফ বেরিয়েছে, শিং খসে গেছে, খুরের জায়গায় থাবা আর নখ হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ বাঘের, কেউ শেয়ালের, কেউ ভালুকের রূপ পেয়েছে। প্রজা-গরুরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই সব, এ কি দেখছি? কোন্ পাপে তোমাদের এই শ্বাপদ-দশা হল? শাসক-গরুরা উত্তর দিলে, হুঁহুঁ, পাপ নয়, আমরা ক্ষত্রিয় হয়েছি, ঘাস খেয়ে রাজকার্য করা চলে না, জাবর কাটতে বৃথা সময় নষ্ট হয়। এখন আমরা আমিষাহারী। ঘরে-বাইরে শত্রুরা ওত পেতে আছে, তোমাদের রক্ষণ আর সেবার জন্য বিস্তর কর্মচারী রাখতে হয়েছে। আমাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়, সেজন্য ক্ষুধাও প্রবল। বনের সব মৃগ আমরা খেয়ে ফেলেছি। যদি সুশাসন চাও তবে তোমরা সকলে কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ করে আমাদের উপযুক্ত আহার যোগাও, যেমন সিংহের আমলে যোগাতে। গরুরা রাজী হল। কিন্তু গুটি কতক ধূর্ত গরু ভাবলে, বাঃ, এরা তো বেশ আছে, সর্দারি করে বেড়াচ্ছে, ঘাস খুঁজতে হচ্ছে না, জাবর কাটতে হচ্ছে না, আমাদেরই হাড় মাস কড় মড় করে খাচ্ছে। আমারাই বা ফাঁকে পড়ি কেন? এই স্থির করে তারা দল বেঁধে শ্বাপদ গরুদের গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দিলে এবং নিজেরাই শাসক হল। কিছুকাল পরে তারাও শ্বাপদ হয়ে গেল এবং তাদের দেখে অন্য গরুদেরও প্রভুত্বের লোভ হল। এই রকমে সমস্ত গরু গুঁতোগুঁতি কামড়াকামড়ি করে

মরে গেল, গোনর্দ দেশ একটি গোভাগাড়ে পরিণত হল।

কানাই। আপনার এই গল্পের মর‍্যাল কি? আপনি কি বলতে চান গণতন্ত্র খারাপ?

মহাবীর। তন্ত্রে রাজ্যশাসন হয় না, মানুষই রাজ্য চালায়। গণতন্ত্র বা যে তন্ত্রই হোক, তা শব্দ মাত্র, লোকে ইচ্ছানুসারে তার ব্যাখ্যা করে।

সুবোধ। ঠিক বলেছেন। ব্রিটেন আমেরিকা রাশিয়া প্রত্যেকেই বলে যে তাদের শাসনতন্ত্রই খাঁটি ডিমোক্রাসি।

মহাবীর। শাসনপদ্ধতির নাম যাই হ'ক দেশের জনসাধারণ রাজ্য চালায় না, তারা কয়েকজনকে পরিচালক রূপে নিযুক্ত করে, অথবা ধাপ্পায় মুগ্ধ হয়ে একজনের বা কয়েকজনের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। এই কর্তারা যদি সুবুদ্ধি সাধু নিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্মপটু হয় তবে প্রজারা সুখে থাকে। কিন্তু কর্তারা যদি মূর্খ হয়, অথবা ধূর্ত অসাধু স্বার্থপর ভোগী আর অকর্মণ্য হয় তবে প্রজারা কষ্ট পায়, কোনও তন্ত্রেই ফল হয় না।

ভুজঙ্গ। আপনার রামরাজ্য কি ছিল? একেবারে অটোক্রাসি, স্বৈরতন্ত্র, প্রজাদের কোন ক্ষমতা ছিল না।

মহাবীর। কে বললে ছিল না? কোশলরাজমহিষী সীতার বনবাস হল কাদের জন্য? শম্বুককে মারা হল কাদের কথায়?

বিপাশা। কিন্তু রামচন্দ্রের এইসব কাজ কি ভাল?

মহাবীর। ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক রামচন্দ্র লোকমত মেনেছিলেন। তখনকার ভাল-মন্দের বিচার করা এখনকার লোকের সাধ্য নয়। লোকমত সৃষ্টি করেন প্রভাবশালী সুবুদ্ধি সাধুগণ, অথবা ধূর্ত অসাধুগণ। রামচন্দ্র নিজের মতে চলতেন না। নিঃস্বার্থ জ্ঞানী ঋষিরা কর্তব্য-অকর্তব্য বেঁধে দিয়েছিলেন, রামচন্দ্র তাই মানতেন, প্রজারাও তাই মানত। এখনকার বিচারে ঋষিদের অনেক বিধানে ত্রুটি বেরুবে, কিন্তু তাঁরা ঐশ্বর্যকামী বা প্রভুত্বকামী ছিলেন না, রাজার কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধেও সকলে প্রায় একমত ছিলেন, সেজন্য কেউ তাঁদের ছিদ্র পেত না, বিপক্ষও হত না।

সুবোধ। অর্থাৎ রামরাজ্য মানে ওয়ান পার্টি ঋষিতন্ত্র। এখন সেইরকম ঋষি যোগাড় করা যায় কি করে?

মহাবীর। ঋষি চাই না। যাঁদের হাতে দেশশাসনের ভার এসেছে তাঁরা যদি বুদ্ধিমান সাধু সিঃস্বার্থ ত্যাগী কর্মী হন তবে লোকমত তাঁদের অনুসরণ করবে।

সুবোধ। কিন্তু ধূর্ত অসাধুরা তাঁদের পিছনে লাগবে, ভাঁওতা দিয়ে স্বপক্ষে ভোট যোগাড় করবে, কর্তৃত্ব দখল করবে।

মহাবীর। কত দিন তা পারবে? স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় তোমাদের বহু লোক বহু বাধা পেয়েছেন, জীবনপাতও করেছেন। তাঁরা স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের সাধনা সফল হয়েছে। রামরাজ্য অর্থাৎ সাধুজন-পরিচালিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠানও সেই রকমের হবে। এই ব্রত

যাঁরা নেবেন তাঁরা নিজের আচরণ দ্বারা প্রজার বিশ্বাস-ভাজন হবেন, উপস্থিত সুবিধার জন্য কুটিল পথে যাবেন না, লোভী ধনপতি অথবা অসাধু সহকর্মীদের সঙ্গে রফা করবেন না, দুষ্কর্ম উপেক্ষা করবেন না। বার বার পরাভূত হলেও তাদের চেষ্টা কালক্রমে সফল হবেই। যত দিন একদল লোক এই ব্রত না নেবেন তত দিন শাসনতন্ত্রের নাম নিয়ে তর্ক করা বৃথা।

কানাই। মহাবীরজী, আপনার ব্যবস্থা এখন অচল, ওতে গণতন্ত্র হবে না। এ যুগে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কেউ নেই।

মহাবীর। তবে সেই গরুদের মতো গুঁতোগুঁতি কামড়া-কামড়ি করে মর গে।

সুবোধ। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে কি অসাধুতা আর অপটুতা নেই? তাদের দেশে তো গণতন্ত্র অচল হয় নি।

মহাবীর। বিদেশে তারা যতই অন্যায় করুক, নিজের দেশ শাসনের জন্য যে সাধুতা আর পটুতা আবশ্যক তা তাদের আছে।

কানাই। যাই বলুন মহাবীরজী, আগে এই ভুজঙ্গ ভায়ার দলটিকে শায়েস্তা করতে হবে, যতসব ঘরভেদী বিভীষণ, দাঙ্গাবাজ খুনে ডাকাত, কুচক্রী কমবক্ত কমরেড।

ভুজঙ্গ। মহাবীরজী, এই কানাইদার দলটিকে ধ্বংস না করলে কিছুই হবে না, যতসব ভেকধারী ভণ্ড, ক্রোড়পতির কুত্তা।

কানাই। মুখ সামলে কথা বল ভুজঙ্গ।

ভুজঙ্গ। যত সব মিটমিটে শয়তান, বিড়াল-তপস্বী, রক্তচোষা বাদুড়।

কানাই গাঙ্গুলি অত্যন্ত চটে উঠে ঘুষি তুলে মারতে এল, ভুজঙ্গ তার হাত ধরে ফেললে। দুজনে ধস্তাধস্তি হতে লাগল।

সুবোধবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, তোমাদের কি স্থান কাল জ্ঞান নেই, এখন মারামারি করছ? ওহে অবধবিহারী, থামিয়ে দাও না।

অবধবিহারী। হামি আজ একাদ্‌সি কিয়েছি বাবুজী, বহুত কমজোর আছি।

বিপাশা। মহাবীরজী, আপনি উপস্থিত থাকতে এই সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই হবে?

ভূতনাথ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং নিমেষের মধ্যে পিছন থেকে লাথি মেরে কানাই আর ভুজঙ্গকে ধরাশায়ী করে দিলে। তার পর আবার নিজের চেয়ারে বসে চোখ কপালে তুলে সমাধিস্থ হল।

গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ভুজঙ্গ বললে, সুবোধবা, আপনার বাড়িতে এই অপমান সইতে হবে?

পাছায় হাত বুলুতে বুলুতে কানাই বললে, কুমোরের পুত্তুর ভূতো নন্দী ব্রাহ্মণের গায়ে লাথি মারবে?

অবধবিহারী। এ কনহৈয়াবাবু, গুস্‌সা করবেন না। লাত তো ভূতনাথবাবুর থোড়াই আছে, খুদ মহাবীরজী লাত লাগিয়েছেন।

কবিরত্ন। ঠিক কথা, ভূতনাথের সাধ্য কি। স্বয়ং শ্রীহনুমান কলহ নিবারণের জন্য লাথি ছুড়েছেন। দেবতার পদাঘাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাতে অপমান নেই।

বিপাশা। যেতে দিন, যেতে দিন। মহাবীরজী, কিছু মনে করবেন না।

অবধবিহারী। আচ্ছা মহাবীরজী, বোলেন তো, রাম-রাজ্য হোনে সে শেয়ার মার্কিট কুছ তেজ হোবে? বড়া নুকসান যাচ্ছে।

মহাবীর উত্তর দিলেন না।

ভূতনাথের মাথা ধীরে ধীরে সোজা হতে লাগল। লক্ষণ দেখে সুবোধবাবু বললেন, কনট্রোল ছেড়ে গেছেন। একটু পরে ভূতনাথ হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বললে, দাদা, একটু চা আনতে বলুন।

অবধবিহারী। আরে ভূতনাথবাবু, মহাবীরজী তো বহুত ঝঞ্ঝট কি বাত বোলিয়েছেন, লাত ভি মারিয়েছেন।

ভূতনাথ। বলেন কি! লাথি মেরেছেন? কাকে? আমাদের কানাইদা আর ভুজঙ্গদাকে? সর্বনাশ, ইশ, বড় অপরাধ হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না দাদারা—আমার কি আর হুঁশ ছিল! দিন, পায়ের ধুলো দিন।

১৩৫৬

শোনা কথা

আমাদের পাড়ায় একটি ছোট পার্ক আছে, চার ধারে একবার ঘুরে আসতে পাঁচ মিনিট লাগে। সকাল বেলায় অনেকগুলি বুড়ো ও আধবুড়ো ভদ্রলোক সেখানে চক্কর দেন। এঁদের ভিন্ন ভিন্ন দল, এক এক দলে তিন-চার জন থাকেন। প্রত্যেক দলের আলাপের বিষয়ও আলাদা, যেমন রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, অমুক সাধুবাবাবার মহিমা, শেয়ার বাজারের দুরবস্থা, আজকালকার ছেলেমেয়ে, ইত্যাদি।

আশ্বিন মাস। একটি দলের কিছু পিছনে বেড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ বৃষ্টি এল; পার্কে টালি দিয়ে ছাওয়া একটি ছোট আশ্রয় আছে, দলের চারজন তাতে ঢুকে পড়লেন। পূর্বে সেখানে দুটো বেঞ্চ ছিল, এখন একটা আছে, আর একটা চুরি গেছে। আমি ইতস্তত করছি দেখে একজন বললেন, ভিতরে আসুন না, ভিজছেন কেন, বেঞ্চে পাঁচজন কুলিয়ে যাবে এখন, একটু না হয় ঘেঁষাঘেঁষি হবে। বাংলায় থ্যাংক ইউ মানায় না, আমি কৃতজ্ঞতাসূচক দন্তবিকাশ করে বেঞ্চের এক ধারে বসে পড়লুম।

অনেক দিন থেকে এঁদের দেখে আসছি, কিন্তু কাকেও চিনি না। অগত্যা কাল্পনিক পরিচয় দিয়ে এঁদের বিচিত্র আলাপ বিবৃত করছি। প্রথম ভদ্রলোকটি—যিনি আমাকে ডেকে নিলেন—শ্যামবর্ণ, রোগা, মাথায় টাক, গোঁফ-কামানো,

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; চোখে পুরু কাচের চশমা, হাতে খবরের কাগজ। এঁকে দেখলেই মনে হয় মাস্টার মশায়। দ্বিতীয় ভদ্রলোকটিকে বহুকাল থেকে আমাদের পাড়ায় দেখে আসছি। এঁর বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি, ফরসা রং, স্থূলকায়, একটু বেশী বেঁটে। পনর বৎসর আগে এঁর কালো গোঁফ দেখেছি, তার পর পাকতে আরম্ভ করতেই বার্ধক্যের লক্ষণ ঢাকবার জন্য কামিয়ে ফেলেন। সম্প্রতি এঁর চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু চামড়া খুব উর্বর, টাক পড়েনি। এই সুযোগে ইনি এখন আবক্ষ দাড়ি-গোঁফ এবং আকণ্ঠ বাবরি চুল উৎপাদন করেছেন, তাতে চেহারাটি বেশ ঋষি ঋষি দেখাচ্ছে। বোধহয় ইনি যোগশাস্ত্র, থিয়সফি, ফলিত জ্যোতিষ, ইলেকট্রোহোমিওপ্যাথি প্রভৃতি গূঢ় তত্ত্বের চর্চা করেন। এঁকে ভরদ্বাজবাবু বলব। তৃতীয় ভদ্রলোকটি দোহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বয়স প্রায় ষাট, কাঁচা-পাকা কাইজারি গোঁফ, চেহারা সম্ভ্রান্ত রকমের, পরনে ইজের ও হাতকাটা কামিজ, মুখে একটি বড় চুরুট। সর্বদাই ভ্রূ একটু কুঁচকে আছেন, যেন কিছুই পছন্দ হচ্ছে না। ইনি নিশ্চয় একজন উঁচুদরের রাজকর্মচারী ছিলেন। এঁকে বাবু বললে হয়তো ছোট করা হবে, অতএব চৌধুরী সাহেব বলব। চতুর্থ লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়-তাল্লিশ, লম্বা মজবুত গড়ন, কালো রং, গায়ে আধময়লা খাদি পাঞ্জাবি। গোঁফটি হিটলারী ধরনে ছাঁটা হলেও দেখতে ভাল-মানুষ, সবিনয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে সঙ্গীদের কথা শোনেন, মাঝে মাঝে আনাড়ীর মতন মন্তব্য করেন। ইনি

কেরানী, কি গানের মাস্টার, কি ভোটের দালাল, তা বোঝা যায় না। এঁকে ভজহরিবাবু বলব।

জিব দিয়ে একটা নৈরাশ্যের শব্দ করে ভজহরিবাবু বললেন, দিন দিন কি হচ্ছে বলুন তো! যা রোজগার করি তাতে খেতেই কুলয় না, ট্রাম বাসে দাঁড়াবার জায়গা নেই, আবার নতুন উপদ্রব জুটেছে বোমা। বড় ছেলেটা বিগড়ে যাচ্ছে, ধমকাবার জো নেই, তার বন্ধুদের লেলিয়ে দিয়ে কোন্‌দিন আমাকেই ঘায়েল করবে।

মাস্টার মশায় বললেন, আট শ বৎসর দাসত্বের পরে দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন অনেকে একটু বেচাল আর অসামাল হবেই। অবাধ্যতা বোমা চুরি-ডাকাতি কালোবাজার ঘুষ সবই কিছুকাল সইতে হবে, অবশ্য প্রতিকারের চেষ্টাও করতে হবে। এই সমস্তই স্বাধীনতাযুগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, অন্য দেশেও এমন হয়েছে।

চৌধুরী সায়েব ধমকের সুরে বললেন, তা বলে বেপরোয়া যাকে তাকে বোমা মারবে?

মাস্টার। এ সমস্তই আমাদের কর্মফল—

ভরদ্বাজবাবু তর্জনী নেড়ে বললেন, যা বলেছ দাদা! সবই প্রারব্ধ, পূর্বজন্মের পাপের ফল।

মাস্টার। আজ্ঞে না, ইহজন্মেরই কর্মফল। আমাদের ব্যক্তিগত কর্মের নয়, জাতিগত কর্মের। অত্যাচারী ইংরেজ আর তাদের এদেশী তাঁবেদারদের মারবার জন্য স্বদেশী যুগের

বিপ্লবীরা বোমা ছুড়তো। আমরা তখন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে বৈঠকখানায় বসে তাদের প্রশংসা করতাম। এখন আর ইংরেজের ভয় নেই, প্রকাশ্যে বলছি—মিউটিনিই প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ, খুদিরামই আদি শহীদ, সেই দেখিয়ে দিলে—দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার, হবে না হবে না খোল তরবার।

ভরদ্বাজ। এই মতিগতির জন্যই দেশ উৎসন্নে যাচ্ছে। খুদিরাম আমাদের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট করেছে, ছেলেদের খুন করতে শিখিয়েছে।

ভজহরি। বলেন কি মশায়! এই সেদিন মহাসমারোহে তাঁর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেল, দেশের বড় বড় লোক উপস্থিত হয়ে সেই মহাপ্রাণ বালকের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

মাস্টার। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এতে খুশী হতেন না। জওহরলালও যেতে চান নি। পূর্বে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে নেতাজী ভারত আক্রমণ করলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে লড়বেন। স্বদেশের মুক্তিকামী হলেই সকলের আদর্শ আর কর্তব্যবুদ্ধি সমান হয় না।

চৌধুরী। খুদিরাম তো ইংরেজকে মেরেছিল, কিন্তু এখন যে আমাদের গায়েই বোমা ফেলছে। একেও কর্তব্যবুদ্ধি বলতে চান নাকি?

ভজহরি। মাস্টার মশায়, আপনি কি খুদিরামের কাজ গর্হিত মনে করেন?

মাস্টার। আমি অতি সামান্য লোক, ধর্মাধর্ম বিচার আমার সাধ্য নয়। কর্মের ফল যা দেখতে পাই তাই বলতে পারি।

খুদিরাম যখন বোমা ফেলেছিল তখন বড় বড় মডারেটরা ধিক্‌কার দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে এই ভয়ংকর পন্থায় তাঁদের আস্থা নেই। খুদিরামের দল নিজের স্বার্থ দেখেনি, প্রাণের মায়া করেনি, ধর্মাধর্ম ভাবেনি, বিনা দ্বিধায় সরকারের সঙ্গে লড়েছিল। তারা শুধু ইংরেজকে বোমা মারেনি, মডারেট বুদ্ধিতেও ফাট ধরিয়েছিল। অনেক মডারেট আড়ালে বলতেন, বাহবা ছোকরা!

চৌধুরী সাহেব অধীর হয়ে বললেন, আপনি কেবল অবান্তর কথা বলছেন, আদালতে এ রকম বললে জজের ধমক খেতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই—ইংরেজ চলে গেছে, দেশনেতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এখন আবার বোমা কেন?

মাস্টার মশায় সবিনয়ে বললেন, আদালতে কখনও যাইনি সার। আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিতে পারি এমন বুদ্ধি আমার নেই। যা মনে আসছে ক্রমে ক্রমে বলে যাচ্ছি, দয়া করে শুনুন। যদি তাড়া দেন তবে সব গুলিয়ে ফেলব।

চৌধুরী। বেশ, বলে যান।

মাস্টার। স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ তাড়ানো, বিদেশী শাসকরা চলে যাবার পর কি করতে হবে তা তারা ভাবে নি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে-কোনও উপায়ে মানুষ মারা তারা পাপ মনে করত না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধের উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু মহাভারতে অন্যত্র আড়াল থেকে বোমা মারতেও বলেছেন।

ভরদ্বাজ। কোথায় আবার বললেন? যত সব বাজে কথা।

মাস্টার। দ্রোণবধের জন্য মিথ্যা বলা এবং দুর্যোধনের কোমরের নীচে গদাঘাত বোমারই শামিল। সাধারণ ধর্ম আর আপদ্‌ধর্ম এক নয়, আপৎকালে অনেকেই অল্পাধিক অধর্মাচরণ করে থাকেন। সন্ত্রাসকরা তাই করেছিল। পরে মহাত্মা গান্ধী যখন যুদ্ধের নূতন উপায় আবিষ্কার করলেন এবং তাতে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাও দেখা গেল তখন সন্ত্রাসকরা নিরস্ত হল। কিন্তু তারা হিংস্রতার জমি তৈরি করে গেল, বহু লোকের ধারণা হল যে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে হিংস্র কর্মে দোষ হয় না, বরং তাতে বাহাদুরিও আছে। সাতচল্লিশ সালের দাঙ্গার সময় অনেক শান্ত শিষ্ঠ হিন্দুসন্তান অসংকোচে খুন করতে শিখল। তার পর মহাত্মাজীও নিহত হলেন। অনেক গণ্যমান্য লোক চুপি চুপি বললেন, ভগবান যা করেন ভালর জন্যই করেন। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, মুক্তিকামীদের আদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্য দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য হিংস্র-অহিংস্র নানা পন্থার উদ্ভব হয়েছে।

চৌধুরী। এখন একমাত্র উদ্দেশ্য শান্তি ও শৃঙ্খলা, তার পন্থা একই—জবরদস্ত গভর্নমেণ্ট।

মাস্টার। আজ্ঞে না। নানা লোকের নানা উদ্দেশ্য, কেউ চান রামরাজ্য, কেউ চান সমাজতন্ত্র, কেউ কিষান-মজদুরের রাজা হতে চান, কেউ চান সমভোগতন্ত্র বা কমিউনিজম। এঁরা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেন না যে ঠিক কি চান, এঁদের পন্থাও সমান নয়, কেউ আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে চান, কেউ তাড়াতাড়ি। কেউ মনে করেন বা মুখে বলেন যে

যথাসম্ভব সত্য ও অহিংসাই শ্রেষ্ঠ উপায়, কেউ মনে করেন শঠে শাঠ্যং না হলে চলবে না, কেউ মনে করেন হিংস্র উপায়েই চটপট কার্যসিদ্ধি হবে। দেখতেই পাচ্ছেন, আজকাল কতগুলি দল হয়েছে—কংগ্রেস, তার মধ্যেও দলাদলি, সমাজতন্ত্রী, হিন্দু-মহাসভা, কমিউনিস্ট, আরও কত কি। এদের মধ্যে ভাল মন্দ হিংস্র অহিংস্র সব রকম লোক আছে।

ভজহরি। কংগ্রেসে হিংস্র লোক নেই।

মাস্টার। তা বলতে পারি না। দলের নীতি বা ক্রীড যাই হোক সকলেই তা অন্তরের সঙ্গে মানে না। সব দলেই এমন লোক আছে যাদের নীতি—মারি অরি পারি যে কৌশলে। অগস্ট বিপ্লবে অনেক কংগ্রেসী হিংস্র কাজ করেছিল। এখনও কংগ্রেসের মধ্যে এমন লোক আছে যারা প্রতিপক্ষকে যে-কোন উপায়ে জব্দ করতে প্রস্তুত।

ভজহরি। কিন্তু কংগ্রেসের ওপর মহাত্মার প্রভাব এখনও রয়েছে। তারা যতই অন্যায় করুক কমিউনিস্টদের মতন বোমা ছোড়ে না।

মাস্টার। হিংস্র কমিউনিস্টদের তুলনায় হিংস্র কংগ্রেসী অনেক কম আছে তা মানি, কিন্তু সব কংগ্রেসী মনে প্রাণে অহিংস নয়, সব কমিউনিস্টও হিংস্র নয়। বিলাতে লাস্কি হালডেন বানাল প্রভৃতি মনীষীরা কমিউনিস্ট, কিন্তু তাঁরা অসৎ বা হিংস্র প্রকৃতির লোক নন, রাশিয়ার অন্ধ ভক্তও নন। এদেশেও যোশী-প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা হিংসার বিরোধী বলে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

চৌধুরী। মাস্টার মশায়, আপনার মতলবটা কি খোলসা করে বলুন তো। বোধ হচ্ছে আপনি কমিউনিস্ট দলের ভক্ত।

মাস্টার। কোন দলেরই ভক্ত নই, মানুষকেই ভক্তি করি। কোন মানুষের সব কাজেরও সমর্থন করি না। দলের লেবেল দেখে বিচার করব কেন, মানুষ কেমন তাই দেখব। কমিউ-নিস্টদের কথাই ধরুন। অনেক লোক আছে যারা মার্কস প্রভৃতির অল্পাধিক বিশ্বাস করে, সেজন্য নিজেদের কমিউ-নিস্ট বলে। এদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রীদের বেশী প্রভেদ নেই। আবার অনেক কমিউনিস্ট গুপ্ত সমিতির সদস্য, তারা স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকদের মতন লুকিয়ে কাজ করে এবং দলের নেতা-দের আদেশে চলে। এদের অনেকে রাশিয়ার তাঁবেদার বা অন্ধ ভক্ত। যেমন কংগ্রেসের মধ্যে তেমন কমিউনিস্ট দলের মধ্যেও স্বার্থসর্বস্ব লোক আছে। অনেক কংগ্রেসী যেমন মন্ত্রিত্বকেই পরম কাম্য মনে করে, সেইরকম অনেক কমিউনিস্ট আশা করে যে ডিক্‌টেটারী রাষ্ট্র স্থাপিত হলে সে একটা কেষ্টবিষ্টুর পদ পাবে। আবার অনেকে, বিশেষত ছেলেমেয়ে, শখের জন্যই কমিউনিস্ট নাম নেয়। এরা কিছুই বোঝে না, শুধু কতকগুলি মুখস্থ বুলি আওড়ায়। আবার এক দল বিশেষ কিছু না বুঝলেও তাদের নেতাদের আদেশে নানা রকম হিংস্র কর্ম করে এবং ভাবে যে দেশের মঙ্গলের জন্যই করছি। এমন দুর্বৃত্তও আছে যাদের কোনও রাজনীতিক মত নেই, কিন্তু সুবিধা পেলেই শুধু নষ্টামির জন্য ট্রাম বাস পোড়ায়, বোমাও ফেলে। ভর্তৃহরি বলছেন, 'তে বৈ মানুষরাক্ষসাঃ পরিহিতং

স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে, যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে'—যারা স্বার্থের জন্য পরের ইষ্টনাশ করে তারা নররাক্ষস, কিন্তু যারা অনর্থক পরের অহিত করে তারা কি তা জানি না।

ভরদ্বাজ। মাস্টার, তোমার কথায় এই বুঝলুম যে অনেক লোক দেশের ভাল করছি ভেবেই হিংস্র কর্ম করে, যেমন স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসকরা করত; অনেকে হুজুক বা বজ্জাতির জন্য করে, অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই করে। কিন্তু দেশের জনসাধারণ হিংস্রতার বিরোধী, তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না, শুধু চায় অন্ন বস্ত্র স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি আর সুশাসন। তোমাদের পলিটিক্সে তা হবে না। ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র সমাজতন্ত্র সমভোগতন্ত্র সমস্তই অচল ও অনাবশ্যক। দিল্লীতে যে ভারতশাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে তাতে কিছুই হবে না।

মাস্টার। কি রকম শাসনতন্ত্র চান আপনিই বলুন।

ভরদ্বাজ। ধর্মরাজ্য চাই। প্রথমেই রাজার আশ্রয় নিতে হবে। প্রত্যেক প্রদেশে একজন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা থাকবেন, তাঁদের সকলের ওপরে একজন সার্বভৌম রাজ-চক্রবর্তী সম্রাট থাকবেন। প্রদেশে ও কেন্দ্রে কেবল বিদ্বান সদ্‌ব্রাহ্মণরা মন্ত্রী হবেন, তাঁরাই আইন করবেন রাজ্য চালাবেন। প্রজাদের কোনও সভা থাকবে না, রাম শ্যাম যদুর খেয়াল অনুসারে রাজ্য চলতে পারে না, তাতে কেবল ঝগড়া হবে। রাজারা সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করবেন, মাঝে মাঝে

যত্ন করে প্রজাদের ধর্মকর্মে উৎসাহ দেবেন। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার পূজা হবে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজবে, ধূপের ধূম উঠবে। রাষ্ট্রের লাঞ্ছনা হবে গরু, বাঘ-সিংগি চলবে না। জাতীয় সংগীত হবে মোহমুদ্গর। ফাঁসি উঠে যাবে, পাপীদের শূলে দেওয়া হবে। অনাচারী নাস্তিক আর বিধর্মীরা রাজকার্য করবে না, তারা নগরের বাইরে বাস করবে।

মাস্টার। চমৎকার, যেন সত্যযুগের স্বপ্ন। আপনার এই ধর্মরাজ্যের সঙ্গে হিটলার-মুসোলিনির রাষ্ট্রের কিছু কিছু মিল আছে। শরিয়তী রাজ্য এবং গোঁড়া রোমান ক্যাথলিকদের আদর্শ খ্রীষ্টীয় রাজ্যও অনেকটা এই রকম। কিন্তু পৃথিবীতে বহু কোটি সনাতনী থাকলেও আপনার আদর্শ ধর্মরাজ্য বা শরিয়তী-খিলাফতী রাজ্য বা হোলি রোমান এম্পায়ার আর হবার নয়।

ভরদ্বাজ। আচ্ছা বাপু, তুমিই বল কোন্ উপায়ে দেশে শান্তি আর সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হবে।

মাস্টার। এমন উপায় জানি না যাতে রাতারাতি আমাদের দুঃখ ঘুচবে। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী আর গুণ্ডা ছাড়া দেশের সকলে শান্তি আর শৃঙ্খলা চায় তা ঠিক, কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোক উদ্‌যোগী বেপরোয়া, জনসাধারণ অলস নিরুদ্যম কাপুরুষ। একটা দশ বছরের ছেলে ট্রামে উঠে যদি বলে—নেবে যান আপনারা, গাড়ী পোড়ানো হবে—অমনি ভেড়ার পালের মতন যাত্রীরা সুড়সুড় করে নেমে যাবে। অত প্রাণের মায়া করলে প্রাণরক্ষা হয় না। জড়পিণ্ড হয়ে শান্তি আর

সুশাসন চাইলে তা মেলে না, শুধু সরকারের ওপর নির্ভর করলেও মেলে না, চেষ্টা করে অর্জন করতে হয়। বিপ্লবীদের যেমন দল আছে শান্তিকামী লোকেও যদি সেইরকম আত্মরক্ষা আর দুষ্টদমনের জন্য দল তৈরী করে তবেই দেশে শান্তি আসবে। তা না হলে মুষ্টিমেয় লোকেরই আধিপত্য হবে।

ভরদ্বাজ। কেন, পুলিশ আর মিলিটারি কি করতে আছে?

মাস্টার। জনসাধারণ যদি সাহায্য না করে তবে তারাও হাল ছেড়ে দেবে।

চৌধুরী সাহেব প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, হবে না, হবে না, আপনারা যে সব উপায় বলছেন তাতে কিছুই হবে না। আপনাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রে গোড়া থেকেই ঘুণ ধরেছে। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—কেন রে বাপু? জমিদার উচ্ছেদ করবার কি দরকার ছিল? তারাই তো দেশের স্তম্ভ-স্বরূপ, চিরকাল গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করে এসেছে। নুনের শুল্ক আর মদ বন্ধ না করলে কি চলত না? ভাবুন দেখি, কতকটা রাজস্ব খামকা নষ্ট করা হয়েছে! কিষান-মজদুরের উপর তো দরদের সীমা নেই, অথচ পেনশেনভোগীদের কথা কারও মনে আসে না। তাদের কি সংসার খরচ বাড়ে নি? রাজা মহারাজ সার রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব তুলে দিয়ে কি লাভ হল? এসব থাকলে বিনা খরচে সরকারের সহায়কদের খুশী করা যেত। রাজভক্ত প্রজাদের বঞ্চিত করা হয়েছে, অথচ

মন্ত্রীরা তো দিব্যি ডি এস-সি, এল্‌-এল্‌ ডি খেতাব নিচ্ছেন! আরে তোদের বিদ্যে কতটুকু? দেশনেতারা সবাই মন্ত্রী হতে চান। তাঁরা কেবল ভাবছেন কিসে ভোট বজায় থাকবে আর প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোষ বোস সেনকে জব্দ করা যাবে। আমি বলছি, আপনাদের এই গভর্নমেণ্ট কিছুই করতে পারবে না, দেশশাসন এদের কাজ নয়।

মাস্টার। চৌধুরী সাহেব, আপনিও কমিউনিস্ট শাসন চান নাকি?

চৌধুরী। টু হেল উইথ কমিউনিস্ট কংগ্রেস হিন্দুসভা অ্যাণ্ড সোশ্যালিস্ট!

মাস্টার। তবে বলুন কি চান?

চৌধুরি। শুনবেন? উঁহু, শেষকালে আমার পেনশনটি বন্ধ না হয়। কোথায় গোয়েন্দা আছে তা তো বলা যায় না।

ভরদ্বাজ। চৌধুরী সাহেব, আমরা আপনার বন্ধু, আমাদের বিশ্বাস করেন না?

চৌধুরী আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন দেখে আমি বললাম, আমি অতি নিরীহ লোক, আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

চৌধুরী সাহেব কিছুক্ষণ আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। ভরসা পেয়ে বললেন, সুশাসনের একমাত্র উপায় বলছি শুনুন।—রাজেন্দ্রজী পণ্ডিতজী আর সর্দারজী বিলেত চলে যান। সেখানে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে বলুন, প্রভু, ঢের হয়েছে, আমাদের শখ মিটে গেছে, আর

স্বাধীনতায় কাজ নেই, আপনারা আবার এসে দেশ শাসন করুন। দু'শ বৎসর এখানে রাজত্ব করেছিলেন, আরও দু'শ বৎসর করুন, পিতার ন্যায় আমাদের জ্ঞানশিক্ষা দিন। তার পর যদি আমাদের লায়েক মনে করেন তবে নিজের দেশে ফিরে আসবেন।

মাস্টার। রোমানরা যখন ব্রিটেন থেকে চলে যাচ্ছিল তখন সেখানকার লোকেও এইরকম প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তাতে ফল হয় নি, বর্বর জার্মানদের আক্রমণ থেকে নিজের দেশ রক্ষার জন্যই রোমানদের চলে যেতে হয়েছিল। এদেশের কোনও নেতা ইংরেজকে ফিরে আসতে বলবেন না, বললেও ইংরেজ আর আসতে পারবে না।

চৌধুরী সাহেব উরুতে চাপড় মেরে বললেন, তবে রইল আপনাদের ভারত, এদেশে আমি থাকব না, বিলেতেই বাস করব।

জিরাফের মতন গলা বাড়িয়ে ভজহরিবাবু মৃদুস্বরে বললেন, সার, আপনার আইভি রোডের বাড়িটা? বেচেন তো বলুন ভাল খদ্দের আমার হাতে আছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে দেখে আমি উঠে পড়লাম। ভরদ্বাজবাবু আমাকে বললেন, কই মশায়, আপনি তো কিছুই বললেন না!

আমি হাত জোড় করে উত্তর দিলাম, মাপ করবেন, কানে তালা লেগে আছে, গলা ভেঙে গেছে। এখন যেতে হবে রণজিৎ ভটচাজ ডাক্তারের কাছে। বসুন আপনারা, নমস্কার।

তিন বিধাতা

সমস্ত উচ্চস্তরের আলাপ অর্থাৎ হাই লেভেল টক যখন ব্যর্থ হল তখন সকলে বুঝলেন যে মানুষের কথাবার্তায় কিছু হবে না, ঐশ্বরিক লেভেলে উঠতে হবে। বিশ্বমানবের হিতার্থী সাধুমহাত্মারা একযোগে তপস্যা করতে লাগলেন। অবশেষে যা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি তা সম্ভব হল, ব্রহ্মা, গড আর আল্লা সুমেরু অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বতে সমবেত হলেন। আরও বিস্তর দেবতা ও উপদেবতার এই ঐশ্বরিক সভার বিতর্কে যোগ দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কায় উদ্‌যোক্তারা কেবল তিন বিধাতাকে আহ্বান করেছিলেন।

ব্রহ্মার সঙ্গে নারদ, গডের সঙ্গে সেণ্ট পিটার এবং আল্লার সঙ্গে একজন পীরও অনুচর রূপে অবতীর্ণ হলেন। তা ছাড়া অনেক অনাহূত দেব দেবী ঋষি সেণ্ট যক্ষ নাগ ভূত পিশাচ এঞ্জেল ডেভিল প্রভৃতি মজা দেখবার জন্য অদৃশ্যভাবে আশে-পাশে অবস্থান করলেন।

ব্রহ্মার মূর্তি সকলেই জানেন,—চার হাত, চার মুখ, একবার মনে হয় দাড়ি-গোঁফ আছে, আবার মনে হয় নেই। পরনে সাদা ধুতি-চাদর, কাঁধে পইতার গোছা, মাথায় মুকুট। গড নিরাকার, তাঁকে দেখবার জো নেই। তথাপি ভক্তগণের

বিশেষ অনুরোধে বাক্যালাপের সুবিধার জন্য তিনি পুরাকালের জিহোভার মূর্তিতে এলেন। বুকভরা কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ, কাঁধভরা চুল, বড় বড় চোখ, কোঁচকানো ভ্রূ, দুর্বাসার মতন রাগী চেহারা, পরনে একটি আলখাল্লা। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে চীনাবাজারে ছবির দোকানে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বিশেষের জন্য এই রকম ছবি বিক্রী হত, এখনও হয় কিনা জানি না।

আল্লা গডের চাইতেও নিরাকার, অনেক অনুরোধেও মূর্তি ধারণ করতে অথবা কোনও কথা বলতে মোটেই রাজী হলেন না। পীরসাহেব বললেন, কোনও ভাবনা নেই, আল্লা সর্বত্র আছেন, এখানেও আছেন; তাঁর মতামত আমিই ব্যক্ত করব। কিন্তু নারদ আর সেণ্ট পিটার বললেন, তুমি যে নিজের কথাই বলবে না তার প্রমাণ কি? পীরসাহেব উত্তর দিলেন, এই চাঁদমার্কা ঝাণ্ডা খাড়া করে রাখছি, এর নীচে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে মুখ করে আমি কথা বলব; আল্লা যদি নারাজ হন তবে এই পবিত্র ঝাণ্ডা আমার মাথায় পড়বে। ব্রহ্মা ও গড এই প্রস্তাবে রাজী হলেন, কারণ আল্লার সেবককে খুশী রাখতে তাঁরা সর্বদাই প্রস্তুত।

নারদ, সেণ্ট পিটার আর পীরসাহেবের বর্ণনা অনাবশ্যক। এঁদের চেহারা যাত্রার আসরে, প্রাচীন ইওরোপীয় চিত্রে এবং ইসলামী সভায় ও মিছিলে দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মা গড ও আল্লা—এঁদের মেজাজ একরকম নয়। ঠাট্টা তামাশায় কোনও হিন্দু দেবতা চটেন না। ব্রহ্মার তো কথাই

নেই, তিনি সম্পর্কে সকলেরই ঠাকুরদা। গড অত্যন্ত গম্ভীর, তবে সম্প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ রসবোধ হয়েছে, তাঁকে নিয়ে একটু আধটু পরিহাস করা চলে। কিন্তু আল্লা শুধু দৃষ্টির অতীত বাক্যের অতীত নন, পরিহাসেরও অতীত। পাকিস্তানী শাসনতন্ত্রের মুখবন্ধে যে আল্লার আধিপত্য ঘোষণা করা হয়েছে তা মোটেই তামাশা নয়।

কালিদাস লিখেছেন, মহাদেবের তপস্যার সময় নন্দীর শাসনে গাছপালা নিস্পন্দ হল, ভোমরা-মৌমাছি চুপ করে রইল, পাখি বোবা হল, হরিণের ছুটোছুটি থেমে গেল,—সমস্ত কানন যেন ছবিতে আঁকা। তিন বিধাতার সমাগমে সুমেরু পর্বতেরও সেই অবস্থা হল; কিন্তু এঁরা ধ্যানস্থ না হয়ে তর্ক আরম্ভ করলেন দেখে স্থাবর জঙ্গম আশ্বাস পেয়ে ক্রমশ প্রকৃতিস্থ হল।

ব্রহ্মাকে দেখেই জিহোভারূপী গড ভ্রূকুটি করে বললেন, তুমি কি করতে এসেছ? তোমাকে তো আজকাল কেউ মানে না, শুধু বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে তোমার ছবি ছাপা হয়। কৃষ্ণ শিব কালী বা রামচন্দ্র এলেও কথা ছিল।

ব্রহ্মা বললেন, তাঁরা আমাকেই প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন।

পীরসাহেব অবাক হয়ে ব্রহ্মার দিকে চেয়ে আছেন দেখে নারদ বললেন, কি দেখছ সাহেব?

পীর চুপি চুপি বললেন, এঁর তো চারো তরফ চার মুহ্। বিছানায় শোন কি করে?

নারদ। শোবার জো কি! ভর রাত ঠায় বসে থাকেন। ইনি ঘুমুলে তো প্রলয় হবে।

পীর। ইয়া গজব!

সেণ্ট পিটার করজোড়ে বললেন, এখন সভার কাজ শুরু করতে আজ্ঞা হোক।

ব্রহ্মা বললেন, মাই হেভন্‌লি ব্রাদার্স, মেরে আসমানী বরাদরান, আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এই সভায় একজন সভাপতি স্থির করা। আমি বয়সে সব চেয়ে বড়, অতএব আমিই সভাপতিত্ব করব।

গড বললেন, তা হতেই পারে না। তুমি হচ্ছ তেত্রিশ কোটির একজন, আর আমি হচ্ছি একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর—

ঝাণ্ডার দিকে সসম্ভ্রমে দুই হাত বাড়িয়ে পীর সাহেব বললেন, ইনিও, ইনিও।

গড। বেশ তো, আমি আর ইনি দুজনেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কিন্তু আমি হচ্ছি সিনিয়ার, অতএব আমিই সভাপতি হব।

ব্রহ্মা। দাদা, কত দিন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছ? জগৎ সৃষ্টি করেছ কবে?

গড। আমার পুত্র যিশু জন্মাবার প্রায় চার হাজার বৎসর আগে।

ব্রহ্মা। তার আগে কি করা হত?

গড। বাংলা বাইবেল পড়নি বুঝি? 'ঈশ্বরের আত্মা জলমধ্যে নিলীয়মান ছিল।'

ব্রহ্মা। অর্থাৎ ডুব মেরে ঘুমুচ্ছিলে। আমাদের নারায়ণ ডোবেন না, ভাসতে ভাসতে নিদ্রা যান। আল্লা তালা কি বলেন ?

পীর। কোরান শরিফ পড়ে দেখবেন, তাতে সব কুছ লিখা আছে।

গড। ব্রহ্মা, তুমি না বিষ্ণুর নাইকুণ্ডু থেকে উঠেছিলে ? তোমারও নাকি জন্মমৃত্যু আছে ?

ব্রহ্মা। তাতে কি হয়েছে। আমার এক-একটি জীবন-কালই যে বিপুল, একত্রিশের পিঠে তেরটা শূন্য দিলে যত হয় তত বৎসর। তুমি যখন জলমধ্যে নিলীয়মান ছিলে তখনও আমি দেদার সৃষ্টি করেছি।

নারদ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, প্রভুরা, আমি বলি কি কে বড় কে ছোট সে তর্ক এখন থাকুক। আপনারা তিনজনেই সভাপতিত্ব করুন।

সেণ্ট পিটার বললেন, সেই ভাল। পীর সাহেব নীরবে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে মাথা নাড়তে লাগলেন।

নারদ বললেন, আপনাদের কষ্ট দিয়ে এখানে ডেকে আনার উদ্দেশ্য—জগতে যাতে শান্তি আসে, মারামারি কাটাকাটি দ্বেষ হিংসা অত্যাচার প্রতারণা লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপকার্য যাতে দূর হয় তার একটা উপায় স্থির করা।

ব্রহ্মা। গড ভায়া, তুমিই একটা উপায় বাতলাও।

গড। উপায় তো বহুকাল আগেই বলে দিয়েছি।

জগতের সমস্ত লোক যিশুর শরণাপন্ন হোক, তাঁর উপদেশ মেনে চলুক, দু-দিনে শান্তি আসবে, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে।

ব্রহ্মা। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ লোকে যিশুর উপদেশ মানছে না। তবু তুমি চুপ করে আছ কেন? তোমার বজ্র ঝঞ্ঝা মহামারী অগ্নিবৃষ্টি এসব কি হল?

গড। সবই আছে, তেমন তেমন দেখলে অন্তিম অবস্থায় প্রয়োগ করব, এখন নয়। আমি মানুষকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছি, যাকে বলে ফ্রি উইল। মানুষ যদি জেনে শুনে উৎসন্নে যায় তো আমি নাচার।

ব্রহ্মা। তা হলে মানছ যে মানুষের কুবুদ্ধি দূর করবার শক্তি তোমার নেই। আল্লা তালার মত কি?

পীর। দুনিয়ার লোকে যদি ইসলাম মেনে নেয় তবে সব দুরুস্ত্ হয়ে যাবে।

নারদ। যারা মেনে নিয়েছে তাদেরও তো গতিক ভাল দেখছি না। আল্লা তাদের খৈরিয়ত করেন না কেন?

পীর। আগে সকলকে পাকিস্তানের সঙ্গে একদিল হতে হবে।

নারদ। তা তো হচ্ছে না। আল্লা জোর করে সকলকে একদিল করে দেন না কেন?

পীর। আল্লার মর্জি।

গড। শোন ব্রহ্মা।—আমি একজোড়া নিষ্পাপ মানুষ-মানুষী সৃষ্টি করে তাদের ইদ্‌ন্ কাননে রেখেছিলুম। তারা

পরম শান্তিতে ছিল, কিন্তু তোমাদের তা সইল না। তোমার এক বংশধর সেখানে গিয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে আদম আর হবাকে নষ্ট করলে।

ব্রহ্মা। সে তো শয়তান করেছিল, তোমারই এক বিদ্রোহী অনুচর।

গড। শয়তান অতি বজ্জাত, কিন্তু আদম-হবাকে সে নষ্ট করে নি, করেছিল বাসুকি, তোমারই এক প্রপৌত্র।

ব্রহ্মা। বাসুকি? সাপ হলেও সে অতি ভাল ছোকরা, কুমন্ত্রণা কখনই দেবে না। আচ্ছা, তাকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। নারদ, ডাক তো বাসুকিকে।

নারদ হাঁক দিলেন—বাসুকি, ওহে বাসুকি—

নিকটেই একটি দেবদারু গাছের ডালে ল্যাজ জড়িয়ে বাসুকি ঝুলছিলেন। ডাক শুনে সড়াক করে নেমে এলেন। দণ্ডবৎ হয়ে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন, কি আজ্ঞা হয় পিতামহ?

ব্রহ্মা। হাঁ হে, তুমি নাকি ইদং কাননে গিয়ে হবা আর আদমকে নষ্ট করেছিলে?

বাসুকি তাঁর চেরা জিব কামড়ে বললেন, ছি ছি, তা কখনও পারি? ভুল শুনেছেন প্রভু। যদি অভয় দেন তো প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করি।

ব্রহ্মা। অভয় দিলুম। তুমি ব্যাপারটা প্রকাশ করে বল।

বাসুকি বলতে লাগলেন।—সে কি আজকের কথা। সমুদ্রমন্থনের পর আমার সর্বাঙ্গে অত্যন্ত বেদনা হয়েছিল।

দুই অশ্বিনীকুমারকে জানালে তাঁরা বললেন, ও কিছু নয়, হাড় ভাঙে নি, শুধু মাংস একটু থেঁতলে গেছে; দিন কতক হাওয়া বদলে এস, সেরে যাবে। তখন আমি পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলুম। বেড়াতে বেড়াতে একদিন ত্রৌরস পর্বতের পাদদেশে এসে দেখলুম উপরে একটি চমৎকার উপবন রয়েছে। ঢোঁড়া সাপের রূপ ধরে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে সড়সড় করে উপরে উঠলুম। দেখলুম দু'টি নরনারী সেখানে বন্দী হয়ে আছে। তারা একেবারে অসভ্য, কিছুই জানে না, লজ্জাবোধও নেই। দেখে আমার দয়া হল। মেয়েটির কাছে গিয়ে মধুর স্বরে বললুম, অয়ি সর্বাঙ্গসুন্দরী, তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? তোমার পরনে কাপড় নেই কেন? চুল বাঁধনি কেন? নখ কাটনি কেন? গলায় হার পরনি কেন? ওই যে ষণ্ডা জংলী পুরুষটা ঘাস কাটছে, ওটা কে? তোমাদের চলে কি করে? খাও কি?

আমার সম্ভাষণে মেয়েটি খুশী হল। একটু হেসে বললে, আমি হচ্ছি হবা। ওর নাম আদম, আমার বর। আমি কারও কন্যা নই, আদমের পাঁজরা থেকে জিহোভা আমাকে তৈরি করেছেন। আমরা এখানে চাষবাস করি, ফলমূল খাই, মনের আনন্দে গান গাই আর নেচে বেড়াই।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি ফল খাও? আম কাঁঠাল কলা আছে?

হবা বললে, আখরোট আঙুর আনার আবজুস আঞ্জীর এইসব মেওয়া খাই। শুধু ওই গাছটার ফল খাওয়া বারণ।

জিহোভা বলেছেন, খেলে সর্বনাশ হবে, আক্কেল খুলে যাবে, ভালমন্দ জ্ঞান হবে।

আমি ল্যাজে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সেই জ্ঞানবৃক্ষের একটা ফল কামড়ে খেলুম। দন্তস্ফুট করা শক্ত, কিন্তু বেশ খেতে। খোসা নেই, বিচি নেই, ছিবড়ে নেই, যেন কড়া পাকের সন্দেশ। পিতামহ, আপনি সর্পজাতিকে আক্কেলদাঁত দেন নি, কিন্তু সেই ফলটি খাওয়া মাত্র আমার চারটি আক্কেলদাঁত ঠেলা দিয়ে বেরুল, বুদ্ধি টনটনে হল, কর্তব্য সম্বন্ধে মাথা খুলে গেল। হবাকে বললুম, ও বাছা, অ্যাদ্দিন করেছো কি, এমন ফল খাও নি?

—প্রভুর যে বারণ আছে।

—ছুত্তোর বারণ। বুড়োদের কথা সব সময় শুনতে গেলে কিছুই খাওয়া হয় না। আমি বলছি, তুমি এক কামড় খেয়ে দেখ।

—যদি আক্কেল খুলে যায়?

—কোথাকার ন্যাকা মেয়ে তুমি? আক্কেল তো খোলাই দরকার, চিরকাল উজবুক হয়ে থাকতে চাও নাকি? নাও, এই দুটো ফল পেড়ে দিচ্ছি, একটা তুমি খাও, আর একটা ওই জংলী ভূত আদমকে খাওয়াও।

হবা নিজে বড় ফলটা খেয়ে ছোটটা আদমকে দিলে। তার পরেই জিব কেটে ছুটে পালাল। একটু পরে একটা ডুমুর-পাতার ঝালর পরে ফিরে এসে বললে, এইবার কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?

—বাঃ, অতি চমৎকার, কোথায় লাগে উর্বশী রম্ভা মেনকা।

হবা ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ কুঁচকে বললে, আমার হার নেই, চুড়ি নেই, চিরুনি নেই, আলতা নেই, ঠোঁটে দেবার রং নেই—

বললুম, সব হবে, ওই আদমকে বল।

আরও ঠোঁট ফুলিয়ে হবা বললে, ও বিশ্রী, কিচ্ছু দেয় না, ওর কিচ্ছু নেই। তুমি দাও, আমি তোমার কাছে থাকব, হুঁ—

বললুম, আমি ওসব কোথায় পাব? ওর হাত পা আছে, আমার তাও নেই। সাপের সঙ্গে তুমি ঘর করবে কি করে? আমার আবার পঞ্চাশটা সাপিনী আছে, তোমাকে দেখেই ফোঁস করে উঠবে। ভাবনা কি খুকী, তোমার বরের কাছে গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে আবদার কর তা হলেই ও রোজগার করতে যাবে, যা চাও সব এনে দেবে।

এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল, বিদ্যুৎ চমকানির সঙ্গে বজ্রনাদ হতে লাগল। দেখলাম দূর থেকে তালগাছের মতন লম্বা এক ভয়ংকর পুরুষ কোঁতকা নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছেন। বুঝলুম ইনিই জিহোভা। আমি হেলে সাপের রূপ ধরে সুড়ুৎ করে পালিয়ে গেলুম।

গ্‌ড বললেন, শুনলে তো, বাসুকি দোষ কবুল করছে।

ব্রহ্মা। দোষ কোথায়? তুমি দুটি প্রাণী সৃষ্টি করে তাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে রেখেছিলে, সামনে জ্ঞানবৃক্ষ রেখেও তার ফল খেতে বারণ করেছিলে। বাসুকি দয়া করে তাদের জ্ঞানদান করেছে।

গড। ছাই করেছে, আমার উদ্দেশ্য পণ্ড করেছে। সেই আদি মানব-মানবীর আদিম অবাধ্যতার ফলেই জগতে পাপ আর দুঃখকষ্ট এসেছে।

সেণ্ট পিটার বললেন, শ্রীকৃষ্ণও তো অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদ করতে বারণ করেছেন।

নারদ। ভুল বুঝেছ বাবাজী। তাঁর কথার অর্থ—বোকা লোকেদের বাজে তর্ক করতে শিখিও না। যারা চালাক তাদের তিনি বুদ্ধিযোগ চর্চা করতে বলেছেন।

সেণ্ট পিটার। কিন্তু হবা আর আদম তো বোকাই।

নারদ। আরে তারা যে আদিম মানব-মানবী, শিশুর সমান। যদি চিরকাল বোকা করে রাখাই উদ্দেশ্য হয় তবে মানুষ সৃষ্টি করার কি দরকার ছিল? ভেড়া গরুর মতন আরও জানোয়ার তৈরি করে লাভ কি? আমাদের পিতামহের কীর্তি দেখ দিকি, প্রথমেই পয়দা করলেন দশ জন প্রজাপতি, মরীচি অত্রি প্রভৃতি দশটি বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজ।

জলদগম্ভীর স্বরে গড্ বললেন, চোপ, গোল করো না। আমার আদেশ লঙ্ঘন করে হবা আর আদম যে আদিম পাপ করেছিল তার ফলেই তাদের সন্ততি মানবজাতি অধঃপাতে যাচ্ছে। এখনও যদি সকলে যিশুর শরণ নেয় তো রক্ষা পাবে।

ব্রহ্মা। লোকে যখন যিশুর শরণ নিচ্ছে না তখন ফ্রি উইল বাতিল করে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দাও না কেন?

সেণ্ট পিটার। ঈশ্বরের অভিপ্রায় বোঝা মানুষের অসাধ্য।

নারদ। আমাদের পিতামহ ব্রহ্মা তো মানুষ নন, তাঁকে অভিপ্রায় জানালে ক্ষতি কি? প্রভু গড না হয় প্রভু ব্রহ্মার কানে কানে বলুন।

পীর। আল্লার যদি মর্জি হয় তবে এক লহমায় বিলকুল শাইস্তা করে দিতে পারেন।

নারদ। তবে শায়েস্তা করেন না কেন?

পীর। যদি মর্জি না হয় তবে শাইস্তা করেন না।

নারদ। বুঝেছি, সব প্রভুই লীলা খেলা খেলেন।

গড। চুপ কর তোমরা। ব্রহ্মা, তুমি কেবল উড়ো তর্ক করছ, যেন আমিই আসামী আর তুমি হাকিম। তোমার প্রজারাও তো কম বদমাশ নয়, তাদের শাসন কর না কেন? তাদেরও ফ্রি উইল আছে নাকি?

ব্রহ্মা। ফ্রি উইল থাকবে কেন। আমার প্রজারা অত্যন্ত বাধ্য, যেমন চালাচ্ছি তেমনি চলছে, আবার কর্মফলও ভোগ করছে।

গড। অর্থাৎ তুমিই তাদের দিয়ে কুকর্ম করাচ্ছ।

ব্রহ্মা। সুকর্ম কুকর্ম সবই করাচ্ছি।

গড। তোমার নীতিজ্ঞান নেই। আমি তোমার মতন পাপের প্রশ্রয় দিই না, এক দল পাপীকে মারবার জন্য আর এক দল পাপী উৎপন্ন করেছি, পরস্পরকে ধ্বংস করবার জন্য দু দলকেই বজ্র দিয়েছি।

পীর। ইয়া গজব, ইয়া গজব! হারামজাদোঁকে দুশমন হারামজাদে!

ব্রহ্মা। তুমি কি মনে কর এই মারামারির ফলে সুবুদ্ধি আসবে ?

গড। বেশ ভাল রকম ঘা খেলে ফ্রি উইলই পন্থা বাতলে দেবে, বেগতিক দেখলে সকলেই যিশুর শরণ নেবে।

পীর। নহি জী, নহি জী।

গড। ব্রহ্মা, এইবার তোমার জেরা বন্ধ কর। তুমি নিজে কি করতে চাও তাই বল।

ব্রহ্মা। কিছুই করতে চাই না। বিশ্বের বিধান তৈরি করে আমি খালাস।

গড। কেন, তুমি দয়াময় নও ?

ব্রহ্মা। আমি নই। হরিকে লোকে দয়াময় বলে বটে।

গড। তুমি সর্বশক্তিমান নও ? তোমার সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য নেই ?

ব্রহ্মা। যার শক্তি কম তারই উদ্দেশ্য থাকে। যে সর্বশক্তিমান তার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েই আছে, তার দয়া করবারই বা দরকার হবে কেন ? আসল কথা চুপি চুপি বলছি শোন। লোকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা বলে, কিন্তু মানুষও আমাদের সৃষ্টি করেছে। যে লোক নিজে নির্দয় সেও একজন দয়ালু ভগবান চায়। যে নিজের তুচ্ছ শক্তি কুকর্মে লাগায় সেও একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চায় যিনি তার সকল কামনা পূর্ণ করবেন। মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায় আমাদের দয়ালু আর সর্বশক্তিমান বানাতে চায়।

গড। ওসব নাস্তিকের বুলি ছেড়ে দাও। স্পষ্ট করে

বল—মানুষ পাপ করলে তুমি রাগ কর? ভাল কাজ করলে তুমি খুশী হও?

ব্রহ্মা তাঁর চার মাথা সজোরে নাড়তে লাগলেন।

নারদ গুন গুন করে বললেন, নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ—প্রভু কারও পাপপুণ্য গ্রাহ্য করেন না।

গড। ব্রহ্মা, তুমি অতি কুচক্রী, মানুষ উৎসন্নে যেতে বসেছে, তবু তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে? কিছুই করবে না?

ব্রহ্মা। তোমরাই বা কি করছ? ব্যস্ত হও কেন, অনন্ত কাল তো সামনে পড়ে আছে। মানুষ নানারকম সুকর্ম কুকর্ম করে ফলাফল পরীক্ষা করছে, কিসে তার সব চেয়ে বেশী লাভ হয় তাই খুঁজছে। যখন সে পরম স্বার্থসিদ্ধির উপায় আবিষ্কার করতে পারবে তখন মানবসমাজে শান্তি আসবে। যতদিন তা না পারবে ততদিন মারামারি কাটাকাটি চলবে।

গড। তবে তুমিও ফ্রি উইল মান?

ব্রহ্মা। খেপেছ!

নারদ তাঁর কচ্ছপী বীণায় ঝংকার তুলে বললেন, ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্, সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া—হে অর্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে আছেন এবং ভেলকি লাগিয়ে তাদের চরকিতে চড়িয়ে ঘোরাচ্ছেন।

সেণ্ট পিটার বললেন, আমাদের প্রভু প্রেমময়, পরম কারুণিক, সর্বশক্তিমান—

নারদ। কিন্তু শয়তানকে জব্দ করতে পারেন না।

পীর। আল্লা মেহেরবান, তাঁর মতলব খুঁজতে গেলে

গুনাহ্ হয়। আল্লার রিয়াসতে কুছ ভি বুরা কাম হয় না।

ব্রহ্মা। শোন গড ভাই—মানুষ নিজে যখন প্রেমময় আর কারুণিক হবে তখন আমরাও তাই হব। তার আগে কিছু করবার নেই।

সেণ্ট পিটার। বলেন কি! আপনারা যদি হাল ছেড়ে দেন তবে লোকে যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাবে। তিন জনে যখন এখানে এসেছেন তখন কৃপা করে একটা ব্যবস্থা করুন যাতে মানুষে মানুষে মিল হয়।

পীর। কভি নহি হো সকতা। আল্লার প্রজা হচ্ছে মিঠা শরবত, গডের প্রজা তেজী শরাব। এদের মিল হতে পারে, শরবত আর শরাব বেমালুম মিশে যায়। কিন্তু এই হজরত ব্রহ্মার প্রজা হচ্ছে বদবুদার অলকতরা।

সহসা আকাশ অন্ধকার হল, একটা ঝটপট শব্দ শোনা গেল, যেন কেউ প্রকাণ্ড ডানা নাড়ছে। ব্রহ্মা বললেন, বিষ্ণু আসছেন নাকি? গরুড় পাখার শব্দ শুনছি।

নারদ বললেন, গরুড় নয়। দেখছেন না, বাদুড়ের মতন ডানা, কালো রং, মাথায় শিং, পায়ে খুর, ল্যাজও রয়েছে। শ্রীশয়তান আসছেন।

সেণ্ট পিটার চিৎকার করে বললেন, অ্যাভণ্ট, দূর হ! পীরসাহেব হাত নেড়ে বললেন, গুম্ শো, তফাত যাও! গড তাঁর আলখাল্লার পকেটে হাত দিয়ে বজ্র খুঁজতে লাগলেন।

ব্রহ্মা বললেন, আহা আসতেই দাও না, আমরা তো কচি খোকা নই যে জুজু দেখলে ভয় পাব।

শয়তান অবতীর্ণ হয়ে মিলিটারি কায়দায় অভিবাদন করে বললেন, প্রভুগণ, যদি অনুমতি দেন তো কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। গড মুখ গোঁজ করে রইলেন। সেণ্ট পিটার আর পীরসাহেব চোখ বুজে কানে আঙুল দিলেন। ব্রহ্মা সহাস্যে বললেন, কি বলতে চাও বৎস?

শয়তান বললেন, পিতামহ, আপনারা তিন বিধাতা এখানে এসেছেন, এমন সুযোগ আর মিলবে না; সেজন্য আপনাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে এসেছি। জগতের সমস্ত ধনী মানী মাতব্বর লোকেরা আমাকে তাঁদের দূত করে পাঠিয়েছেন। তাঁরা চান কর্মের স্বাধীনতা, কিন্তু তার ফলে ইহলোক বা পরলোকে তাঁদের কোনও অনিষ্ট যেন না হয়। এর জন্য তাঁরা আপনাদের খুশী করতে প্রস্তুত আছেন।

ব্রহ্মা। অর্থাৎ তাঁরা বেপরোয়া দুষ্কর্ম করতে চান। মূল্য কি দেবেন? চাল-কলার নৈবেদ্য? হোমাগ্নিতে সের দশেক ভেজিটেবল ঘি ঢালবেন?

শয়তান। না প্রভু, ওসব নিয়ে আপনাদের আর ভোলানো যাবে না তা তাঁরা বোঝেন। তাঁরা যা রোজগার করবেন তার একটা অংশ আপনাদের দেবেন।

ব্রহ্মা। নগদ টাকা আমরা নিতে পারি না।

শয়তান। নগদ টাকা নয়। আপনাদের খুশী করবার জন্য তাঁরা প্রচুর খরচ করবেন। মন্দির গির্জা মসজিদ মঠ

আতুরাশ্রম বানাবেন, হাসপাতাল রেড ক্রস স্কুল কলেজ টোল মাদ্রাসায় এবং মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মোটা টাকা দেবেন, বুভুক্ষুকে খিচুড়ী খাওয়াবেন, শীতার্তকে কম্বল দেবেন। আপনার মানসপুত্রদের বংশধর কে কে আছেন বলুন, তাঁদের বড় বড় চাকরি আর মোটর কার দেওয়া হবে। এইসবের পরিবর্তে আপনারা আমার মক্কেলগণকে নিরাপদে রাখবেন।

ব্রহ্মা। কত খরচ করবেন ?

শয়তান। ধরুন তাঁদের উপার্জনের শতকরা এক ভাগ।

ব্রহ্মা। তাতে হবে না বাপু।

শয়তান। আচ্ছা, দু পারসেণ্ট ?

ব্রহ্মা। আমাকে দালাল ঠাউরেছ নাকি ?

শয়তান। পাঁচ পারসেণ্ট ? দশ—পনর—বিশ ? আচ্ছা, না হয় শতকরা পঁচিশ ভাগ আপনাদের প্রীত্যর্থে খয়রাত করা হবে। তাতেও রাজী নন ? উঃ, আপনার খাঁই দেখছি দেশসেবকদের চাইতেও বেশী। ক বছর জেল খেটেছেন প্রভু ? আচ্ছা, আপনিই বলুন কত হলে খুশী হবেন।

ব্রহ্মা। শতকরা পুরোপুরি এক শ চাই।

নারদ। ওহে শয়তান, প্রভু বলছেন, কর্মের সমস্ত ফল সমর্পণ করতে হবে তবেই নিষ্কৃতি মিলবে।

শয়তান। তা হলে তো রোজগার করাই বৃথা। যদি সবই ছেড়ে দিতে হয় তবে চুরি ডাকাতি লুটপাট মারামারি করে লাভ কি ?

ব্রহ্মা। এই কথা তোমার মক্কেলদের বুঝিয়ে দিও। কিছু হাতে রেখে চুক্তি করা যায় না। গড আর আল্লা তালা কি বলেন? কই, এরা সব গেলেন কোথা?

নারদ। সবাই অন্তর্হিত হয়েছেন।

শয়তান। তবে আমিও যাই পিতামহ। আপনি তো নিরাশ করলেন।

ব্রহ্মা। একটু থাম, শুধু হাতে ফিরে যেতে নেই। একটা বর দিচ্ছি।—বৎস শয়তান, পুরুত পাদরী মোল্লা, পুলিস সৈন্য বা মিলিত জাতিসংসদ, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, তোমার মক্কেলদের তুমি নির্বিঘ্নে নরকস্থ করতে পারবে। তারপর আমি আবার মানুষ সৃষ্টি করব। নারদ, এখন যাই চল, আমার হাঁসটাকে ডেকে আন।

নারদ। প্রভু, সে মানস সরোবরে চরতে গেছে, এত শীঘ্র সভাভঙ্গ হবে তা তো জানত না। আপনি আমার ঢেঁকিতেই চলুন।

১৩৫৭

ভীমগীতা

প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় কুরুপাণ্ডব বীরগণ নিজ নিজ শিবিরে ফিরে এসে স্নান ও জলযোগের পর বিশ্রাম করছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খাটিয়ায় শুয়ে আছেন, দু জন বামন সংবাহক তাঁর হাত পা টিপে দিচ্ছে। এমন সময় ভীমসেন এসে বললেন, বাসুদেব, ঘুমুলে নাকি ?

কৃষ্ণ কুন্তীপুত্রদের মামাতো ভাই। তিনি অর্জুনের প্রায় সমবয়সী, সেজন্য যুধিষ্ঠির আর ভীমকে সম্মান করেন। ভীমকে দেখে বিছানা থেকে উঠে বললেন, আসতে আজ্ঞা হোক মধ্যম পাণ্ডব। আপনি বিশ্রাম করলেন না ?

ভীম বললেন, আমার বিশ্রামের দরকার হয় না। চার ঘটি মাধ্বীক পান করেছি, তাতেই ক্লান্তি দূর হয়েছে, এখনই আবার যুদ্ধে লেগে যেতে পারি। কৃষ্ণ, তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করছি না তো ?

কৃষ্ণ। না না, আপনি এই খট্বায় বসুন। সেবকের প্রতি কি আদেশ বলুন।

ভীম। তোমার কাছে কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

কৃষ্ণ। চোক্কমল্ল তোক্কমল্ল, তোমরা এখন যেতে পার, আর আমার সেবার প্রয়োজন নেই। আর্য ভীমসেন, বলুন কি জানতে চান।

ভীম। হাঁ হে কেশব, আজ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের কি হয়ে-

ছিল? তুমি তাকে কিসব বলছিলে? আমি দূরে ছিলুম, শুনতে পাই নি, শুধু দেখেছি—অর্জুন তার ধনুর্বাণ ফেলে দিয়ে কাঁদছিল; হাত জোড় করছিল, পাগলের মতন ফ্যালফ্যাল করে তোমার দিকে তাকাচ্ছিল আবার বার বার নমস্কার করছিল। ব্যাপার কি? যদি গোপনীয় না হয় তবে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

কৃষ্ণ। বিশেষ কিছুই নয়। কুরুপাণ্ডব দু পক্ষেই গুরুজন বয়স্য ও স্নেহভাজন আত্মীয়গণ আছেন দেখে অর্জুন কৃপাবিষ্ট হয়েছিলেন। বলছিলেন, যুদ্ধ করবেন না।

ভীম। অজুনটা চিরকাল ওইরকম, মাঝে মাঝে তার ভাব উথলে ওঠে। কৃপাবিষ্ট হবার আর সময় পেলেন না! তা তুমি তাকে কি বললে?

কৃষ্ণ। বললুম, তুমি ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তাতে লাভও আছে, যদি জয়ী হও তো পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করবে, যদি মর তো সোজা স্বর্গে যাবে।

ভীম। একেবারে খাঁটি কথা। তাতে অর্জুনের আক্কেল হল?

কৃষ্ণ। সহজে হয় নি। তাকে অনেক রকমে বুঝিয়ে বললুম, তুমি নিষ্কাম হয়ে কর্তব্য কর্ম কর, ফলাফল ভেবো না। তার পর তাকে কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ প্রভৃতিও বোঝালুম। অর্জুনের মোহ্ দূর করতে আমাকে প্রায় দুটি ঘণ্টা বকতে হয়েছিল।

ভীম। দুর্যোধনের দল আমাদের উপর কিরকম অত্যাচার

করেছিল অর্জুন তা ভুলে গেছে নাকি? তুমি সব মনে করিয়ে দিয়েছিলে তো?

কৃষ্ণ। মনে করিয়ে দেবার কথা আমার মনেই পড়ে নি।

ভীম। বল কি হে মধুসূদন! ছেলেবেলায় আমাকে বিষ খাইয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল, জতুগৃহে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল, এসব কথা অর্জুনকে বল নি?

কৃষ্ণ। কই না।

ভীম। আশ্চর্য্য, এর মধ্যেই তোমার ভীমরতি হল নাকি? পাশা খেলায় শকুনির জুয়োচুরি, দুঃশাসনের হাতে পাঞ্চালীর নিগ্রহ, এসবও মনে করিয়ে দাও নি! উঃ দুঃশাসনের নাম করলেই আমার রক্ত টগবগ করে ফুটে ওঠে। আচ্ছা, আমাদের কথা না হয় ছেড়ে দিলে, কিন্তু তুমি যখন ধর্মরাজের দূত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবসভায় গিয়েছিলে তখন দুর্যোধন তোমাকে বন্দী করতে চেয়েছিল। তার পর সেদিন শকুনির ব্যাটা উলূক এসে দুর্যোধনের হয়ে তোমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে গেল, এও তুমি ভুলে গেছ নাকি?

কৃষ্ণ। কিছুই ভুলি নি। কিন্তু যুদ্ধের আগে এসব কথা অর্জুনকে বলবার প্রয়োজন দেখি না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন পাঁচটি মাত্র গ্রাম চেয়েছিলেন তখন তো কৌরবদের সমস্ত অপরাধ মন থেকে মুছে ফেলেছিলেন। দুর্যোধন আমার প্রস্তাবে সম্মত হন নি, তাই আপনাদের মন্ত্রণাসভায় যুদ্ধ করা স্থির হয় এবং সেজন্যই আপনারা যুদ্ধ করছেন। কৌরবদের অপরাধ স্মরণ করা এখন নিরর্থক।

হাতে হাত ধরে ভীম বললেন, কৃষ্ণ, তোমার শরীরে কি ক্রোধ বলে কিছুই নেই ?

কৃষ্ণ। আছে বই কি। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন মানুষের সব দোষই আছে।

ভীম। ক্রোধকে দোষ বলতে চাও! তুমি তো একজন মস্ত পণ্ডিত—আমাদের ছটি রিপু আছে জান ? তাতে আমাদের কত উপকার হয় ভেবে দেখেছ ?

কৃষ্ণ। রিপু তো দমন করা উচিত।

ভীম। দমনের মানে কি লোপ ? রিপুর লোপ হলে মানুষ পাথর হয়ে যায়, যেমন আমাদের ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব হয়েছেন। মেয়েরা তাঁকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই স্নান করে।

কৃষ্ণ। প্রথম তিন রিপুর দমন এবং শেষ তিনটির লোপ করতে পারলেই মঙ্গল হয়।

ভীম। এইবারে তুমি কতকটা পথে এসেছ। মদ মোহ মাৎসর্য—এই তিনটে প্রবল হলে মানুষের বুদ্ধিনাশ হয়, একেবারে লোপ পেলেও বোধ হয় বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু প্রথম তিনটি না থাকলে বংশরক্ষা হয় না, আত্মরক্ষা হয় না, ধনাগম হয় না।

কৃষ্ণ। সাধু সাধু! ভীমসেন, আপনি অনেক চিন্তা করেছেন দেখছি।

ভীম খুশী হয়ে বললেন, ওহে জনার্দন, তুমি হয়তো মনে কর যে মধ্যম পাণ্ডব শুধুই একজন গোঁয়ারগোবিন্দ দুর্ধর্ষ বীর, যুদ্ধ

আর ভোজন ছাড়া কিছুই জানে না তা নয়, আমি দর্শনশাস্ত্রেরও একটু আধটু চর্চা করেছি। যদি চাও তো কিঞ্চিৎ তত্ত্বকথা শোনাতে পারি।

আগ্রহ দেখিয়ে কৃষ্ণ বললেন, অবশ্যই শুনব, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন।

ভীম। ছয় রিপুর মধ্যে প্রথম তিনটিই আবশ্যক, আবার সেই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি, কাম আর ক্রোধ, না হলেই নয়। কামতত্ত্ব তোমাকে বোঝান বাহুল্য মাত্র, লোকে বলে তোমার নাকি ষোল হাজার কারা সব আছেন—

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, লোকে বলে আপনি প্রত্যহ ষোল হাজার লাড্ডু ভোজন করেন। উড়ো কথায় কান দেবেন না। কামতত্ত্ব থাক, আপনি ক্রোধতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ভীম। কোনও বিষয়ের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেশী খেলে মেদবৃদ্ধি হয়, উদর স্ফীত হয়, যুদ্ধের শক্তি কমে যায়। কিন্তু উপযুক্ত আহার না হলে জীবনরক্ষাও হয় না। অত্যধিক ক্রোধও ভাল নয়, তাতে হাত পা কাঁপে, লক্ষ্যভ্রংশ হয়, যুদ্ধে নিপুণতার হানি হয়। কিন্তু ক্রোধ বর্জন করলে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কৃষ্ণ। ক্রোধ ত্যাগ করেও তো আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা যায়।

ভীম। যেমন কাম ত্যাগ করে বংশরক্ষা করা যায়। কৃষ্ণ বাজে কথা বলো না।

কৃষ্ণ। অনেক যোগী তপস্বী আছেন যাঁদের ক্রোধ মোটেই নেই।

ভীম। তাঁদের কথা ছেড়ে দাও। তাঁদের স্বজন নেই, আত্মরক্ষারও দরকার হয় না। সকলেই জানে তাঁরা শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলতে পারেন, সেজন্য কেউ তাঁদের ঘাঁটায় না, তাঁরাও নির্বিবাদে অক্রোধী অহিংস্র হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা তপস্বী নই, তাই দুর্যোধন শক্রতা করতে সাহস করে। অন্যায়ের প্রতিকার এবং দুষ্টের দমনের জন্যই বিধাতা ক্রোধ সৃষ্টি করেছেন। একাদশ রুদ্র আমাদের দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, দেহীর অপমান হলে তাঁরা রক্তে রৌদ্ররস সঞ্চার করেন, তার ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করে, কোনও রকম বিচারের দরকার হয় না। বুঝতে পারলে ?

কৃষ্ণ। আজ্ঞে হাঁ বুঝেছি।

ভীম। যদি তৎক্ষণাৎ অপমানের শাস্তি দেওয়া কোনও কারণে অসম্ভব হয় তবে ক্রোধ মন্দীভূত হয়, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। এই কারণেই বীরগণ যুদ্ধের পূর্বে নিজের বিক্রম ঘোষণা করে এবং শত্রুকে কটুবাক্য বলে ক্রোধ জ্বালিয়ে নেন। শত্রুও অশ্রাব্য ভাষায় পালটা গালাগালি দেয়, তা শুনে রৌদ্ররসের পুনঃসঞ্চার হয়, উত্তেজনা আসে, প্রহারশক্তি বৃদ্ধি পায়।

কৃষ্ণ। কিন্তু জ্ঞানীদের উপদেশ—অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে।

ভীম। গোবিন্দ, তুমি নিতান্তই হাসালে। কংসকে

মেরেছিলে কেন? জরাসন্ধকে মারবার জন্য আমাকে আর অর্জুনকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন। রাজসূয় যজ্ঞের সভায় শিশুপালের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলে কেন? তোমার অক্রোধ কোথায় ছিল? আজ রণক্ষেত্রে অর্জুনের অক্রোধ দেখেও তাকে যুদ্ধে উৎসাহ দিলে কেন? কৃষ্ণ, তুমি নিজের মতিগতি বুঝতে পার না, পাত্রাপাত্রের ভেদও জান না। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। বিপক্ষ যদি সজ্জন হয়, তার শত্রুতা যদি ভ্রান্ত ধারণার জন্য হয়, তবে অক্রোধ আর অহিংসা চলতে পারে। ভদ্র বিপক্ষ যদি দেখে যে অপর পক্ষ প্রতিহিংসার চেষ্টা করছে না, শুধু ধীরভাবে প্রতিবাদ করছে, তবে তার ক্রোধ শান্ত হয়ে আসে, সে ন্যায়-অন্যায় বিচারের সময় পায়, নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়। হয়তো মার্জনা চাইতে সে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু অপর পক্ষ যদি উদারতা দেখায় তবে সহজেই শত্রুতার অবসান হয়। বিরাট রাজা—আহা বেচারার দুই ছেলে আজ মারা গেল—কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠিরকে পাশা ছুড়ে মেরেছিলেন, রক্তপাত করেছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির রাগ দেখান নি। বিরাট ভদ্রলোক, সেজন্য যুধিষ্ঠিরের অক্রোধে ফল হল, ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল। আর দুর্যোধনকে দেখ। তার সহস্র অপরাধ আমাদের ধর্মরাজ ক্ষমা করেছেন, দুরাত্মাকে সুযোধন বলে আদর করেছেন, কিন্তু তার ফল কিছুই হয়নি। কারণ, দুর্যোধন ভদ্র নয়, স্বভাবত দুর্বৃত্ত। তার ভাইরা, শকুনি মামা, আর উচ্ছিষ্টভোজী সূতপুত্র কর্ণও সমান নরাধম। ধর্মরাজের সহিষ্ণুতার ফলে এদের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে। এই সব

দেখেও কি তুমি বলবে যে অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করতে হবে?

কৃষ্ণ। ভীমসেন, আপনার যুক্তি যথার্থ। অক্রোধ দ্বারা সজ্জনকেই জয় করা যায়, কিন্তু দুর্জনকে জয় করবার জন্য ধর্মযুদ্ধ আবশ্যক। আপনারা সেই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ধর্মযুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিশোধের প্রবৃত্তি বর্জনীয়। যদি যুদ্ধই কর্তব্য হয় তবে রাগদ্বেষ ত্যাগ করতে হবে। এই কারণেই দুর্যোধনের অপরাধের কথা অর্জুনকে মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্যক মনে করি না।

ভীম। প্রকাণ্ড ভুল করেছ। সোজা উপায় ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথে গেছ, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়েছ, দু ঘণ্টা ধরে তত্ত্বকথা শুনিয়ে অতি কষ্টে অর্জুনকে যুদ্ধে নামাতে পেরেছ। যদি তাকে রাগিয়ে দিতে তবে তখনই কাজ হত, কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ কিছুই দরকার হত না। এই আমাকে দেখ,—বিধাতা শাস্ত্রজ্ঞান বেশী দেন নি, কিন্তু আমার জঠরে যেমন অগ্নিদেব আছেন তেমনি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রুদ্রগণ নিরন্তর বিরাজ করছেন। কেউ যদি আমাকে অপমান করে তবে একাদশ রুদ্র ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার দেহে শত হস্তীর বল আসে, বাহু লৌহময় হয়, গদা তৎক্ষণাৎ শত্রুর প্রতি ধাবিত হয়, তত্ত্বকথা শোনবার দরকারই হয় না।

কৃষ্ণ। আপনার কথা সত্য। কিন্তু সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়, আপনারা পাঁচ ভ্রাতা সকলেই ক্রোধপ্রবণ নন। আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহ দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু ধর্মরাজ আর

অর্জুনের উপর রুদ্রগণের প্রভাব অল্প, সেজন্য মাঝে মাঝে তাঁদের তত্ত্বকথা শোনাতে হয়। আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হওয়া কি ভাল? পরিণাম না ভেবে প্রবল শত্রুকে আক্রমণ করলে অনেক সময় নিজের ও আত্মীয়বর্গের সর্বনাশ হয়।

ভীম। জন কয়েকের সর্বনাশ হলই বা। সাপের মাথায় পা দিলে সাপ অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ছোবল মারে। তার পর হয়তো সে লাঠির আঘাতে মরে, কিন্তু তার জাতির খ্যাতি বেড়ে যায়। লোকে বলে, সর্পজাতি অতি ভয়ানক, সাবধান, ঘাঁটিও না। বাঘ যখন বাছুরকে ধরে তখন গরু প্রাণের মায়া করে না, ক্রোধের বশে শত্রুকে শৃঙ্গাঘাত করে। এজন্য সকলেই শৃঙ্গীকে সম্মান করে। যে লোক পরিণাম না ভেবে ক্রোধের বশে শত্রুকে আঘাত করে, সে হঠকারিতার ফলে নিজে মরতে পারে, তার আত্মীয়রাও মরতে পারে, কিন্তু তার স্বজাতির খ্যাতি ও প্রতাপ বেড়ে যায়। হৃষীকেশ, ক্রোধ বিধিদত্ত মনোবৃত্তি, নামে রিপু হলেও মিত্র, তার নিন্দা করো না। ক্রোধের প্রভাবে আমি কি দারুণ কর্ম করব তা দেখতে পাবে। ধৃতরাষ্ট্রকে নির্বংশ করব, দুঃশাসনের রক্তপান করব, দুর্যোধনের উরু চূর্ণ করব। আমার কীর্তি হবে কি অকীর্তি হবে তা গ্রাহ্য করি না; কিন্তু লোকে চিরকাল বলবে, হাঁ, ভীম একটা পুরুষ ছিল বটে, অত্যাচার সইত না, দুরাত্মাদের শাস্তি দিতে জানত।

কৃষ্ণ। বৃকোদর, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হবে। আপনি

যা বললেন তাও তত্ত্বকথা। কিন্তু কোনও বিধানই সর্বত্র খাটে না। অত্যাচারিত হলে যে রাগ করে না, প্রতিকারও করে না, সে অক্রোধী, কিন্তু কাপুরুষ, অমানুষ, জীবনধারণের অযোগ্য। সে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পাপ করে ফেলে, সে হঠকারী দুষ্কর্মা, কিন্তু তার পৌরুষ আছে। যে ক্রোধের বশে ধর্মাধর্মের জ্ঞান হারায় না এবং অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ভীম সহাস্যে বললেন, যদুনন্দন, আমি কাপুরুষ অমানুষ নই, ধর্মভীরু পুরুষশ্রেষ্ঠও নই, আমি মধ্যম পাণ্ডব, সকল বিষয়েই মধ্যম। আচ্ছা, এখন যাচ্ছি, তুমি বিশ্রাম কর।

কৃষ্ণ নমস্কার করে বললেন, ভীমসেন, আপনি বীরাগ্রগণ্য পুরুষশার্দূল। আপনার জয় হোক।

কৃষ্ণের দুই পরিচারক চোক্কমল্ল আর তোক্কমল্ল আড়ি পেতে সব শুনছিল। ভীম চলে গেলে তোক্ক বললে, দাদা, কার কথা ঠিক, শ্রীকৃষ্ণের না শ্রীভীমের?

চোক্ক বললেন, ওসব বড় বড় লোকের বড় বড় কথা, তোর আমার মতন বেঁটেদের জন্য নয়। ক্রোধ অক্রোধ ধর্মযুদ্ধ, সবই আমাদের নাগালের বাইরে। দুর্বলের একমাত্র উপায় জোট বাঁধা। বোলতার ঝাঁক বাঘ-সিংগিকেও জব্দ করতে পারে।

সিদ্ধিনাথের প্রলাপ

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় পাশের বাড়িতে পোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল। সিদ্ধিনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আর একটি বেকারের আগমন হল।

গৃহস্বামী গোপাল মুখুজ্যে বললেন, সিধু, তুমি দিন দিন দুর্মুখ হচ্ছ। কত হোম যাগ আর মানত করে বুড়ো বয়সে মল্লিক মশায় একটি বংশধর লাভ করলেন। প্রতিবেশীর সৌভাগ্যে আমাদের সকলেরই খুশী হবার কথা, আর তুমি ধরে নিচ্ছ যে ছেলেটি বেকার হবে!

আবার একটি নিঃশ্বাস ফেলে সিদ্ধিনাথ বললেন, দেশবাসীর আধপেটা অন্নের আর এক জন ভাগীদার জুটল।

ঘরে চার জন আছেন। গোপালবাবু উকিল। বয়স চল্লিশ, বেশ পসার করেছেন। সিদ্ধিনাথ তাঁর সমবয়সী বাল্যবন্ধু, গোপালবাবুর বাড়ির পিছনেই তাঁর বাড়ি। পূর্বে সরকারী কলেজে প্রোফেসারি করতেন বিদ্যার খ্যাতিও ছিল, কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় চাকুরি গেছে। এখন আগের চাইতে অনেক ভাল আছেন, কিন্তু মাথার গোলমাল সম্পূর্ণ দূর হয় নি। সামান্য পেনসনে এবং বাড়িতে দু-চারটি ছাত্র পড়িয়ে কোনও রকমে সংসার চালান। তৃতীয় লোকটি রমেশ ডাক্তার, বয়স ত্রিশ, কাছেই বাড়ি, সম্প্রতি গোপালবাবুর শালী

অসিতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রমেশ তার স্ত্রীর সঙ্গে রোজ এই সান্ধ্য আড্ডায় আসে। আজও দুজনে এসেছে।

অসিতা সিদ্ধিনাথের কাছে পড়েছে, তাঁকে শ্রদ্ধাও করে। সবিনয়ে বললে, সার, মল্লিক মশায়ের ছেলে বেকার হতে যাবে কেন? পৈতৃক ব্যবসাতে ভাল রোজগারও তো করতে পারে। পরের অন্নেই বা ভাগ পাড়বে কেন, তার বাপের তো অভাব নেই।

সিদ্ধিনাথ বললেন, মল্লিকের ছেলে হাইকোর্টের জজ হতে পারে, জওহরলাল বা বিড়লা-ডালমিয়াও হতে পারে, বহু লোককে অন্নদানও করতে পারে। কিন্তু আমি শুধু তাকে উদ্দেশ করে বলি নি, যারা জন্মাচ্ছে তাদের অধিকাংশের যে দশা হবে তাই ভেবে বলেছি?

গোপালবাবু বললেন, দেখ সিধু, আমরা তোমার মতন পণ্ডিত নই, কিন্তু এটুকু জানি, দেশে যে খাদ্য জন্মায় তাতে সকলের কুলয় না, আর লোকসংখ্যাও অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে, তার চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। যিনি জীবের সৃষ্টিকর্তা তিনিই রক্ষাকর্তা এবং আহারদাতা।

সিদ্ধিনাথ। সৃষ্টিকর্তা সব সময় রক্ষা করেন না, আহারও দেন না। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে ওসব মোলায়েম কথা বলা চলত, যখন দেশ ভাগ হয় নি, লোকসংখ্যাও অনেক কম ছিল। তখন এক কবি সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং বলে জন্মভূমির বন্দনা করেছিলেন, আর এক কবি গেয়েছিলেন—চিরকল্যাণময়ী

তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন। এখন দেশ বিদেশ থেকে অন্ন আমদানি করতে হচ্ছে।

গোপাল। সরকার ফসল বাড়াবার যে পরিকল্পনা করেছেন তাতে এক বছরের মধ্যেই আমরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে পারব।

সিদ্ধিনাথ। হাঁ, যদি কর্তাদের উপদেশ অনুসারে চাল আটার বদলে টাপিওকা রাঙা আলু আর মহামূল্য ফল খেয়ে পেট ভরাতে পার। যদি ঘাস হজম করতে শেখ, আসল দুধের বদলে সয়া বা চীনে বাদাম গোলা জলে তুষ্ট হও, যদি উপোসী বেরালের মতন মাছের অভাবে আরসোলা টিকটিকি খেতে পার তবে আরও চটপট স্বয়ম্ভর হতে পারবে।

গোপাল। শুনছি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে দুগ্ধতরু আসছে, যা পয়স্বিনী গাভীর মতন দুগ্ধ ক্ষরণ করে।

সিদ্ধিনাথ। আরও কত কি শুনবে। রাশিয়া থেকে এক্সপার্ট আসবেন যিনি ব্যাং থেকে রুই কাতলা তৈরি করবেন। শোন গোপাল, কর্তারা যতই বলুন, লোক না কমালে খাদ্যাভাব যাবে না।

রমেশ ডাক্তার লাজুক লোক, পত্নীর ভূতপূর্ব শিক্ষককে একটু ভয়ও করে। আস্তে আস্তে বললে, আমার মত জনসাধারণকে বার্থ কনট্রোল শেখাবার জন্য হাজার হাজার ক্লিনিক খোলা দরকার।

সিদ্ধিনাথ। তাতে ছাই হবে। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে কিছু ফল হতে পারে, কিন্তু আর সকলেই

বেপরোয়া বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে। যত দুর্দশা বাড়বে ততই মা ষষ্ঠীর দয়া হবে, কেল্টে ভুল্টু বুঁচী পেঁচীতে ঘর ভরে যাবে। বহুকাল পূর্বেই হার্বার্ট স্পেনসার আবিষ্কার করেছিলেন যে যারা ভাল খায় তাদের সন্তান অল্প হয়, যাদের অন্নাভাব তাদেরই বংশবৃদ্ধি বেশী।

গোপাল। তা তুমি কি করতে বল?

সিদ্ধিনাথ। প্রাচীন কালে গ্রীসে স্পার্টা প্রদেশের কি প্রথা ছিল জান? সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তার বাপ তাকে একটা চাঙারিতে শুইয়ে পাহাড়ের ওপর রেখে আসত। পরদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তাকে ঘরে আনা হত। এর ফলে খুব মজবুত শিশুরাই রক্ষা পেত, রোগা পটকারা বেঁচে থেকে সুস্থ বলিষ্ঠ প্রজার অন্নে ভাগ বসাত না। এদেশেও সেইরকম একটা কিছু ব্যবস্থা দরকার।

গোপাল। কিরকম ব্যবস্থা চাও বলে ফেল।

সিদ্ধিনাথ। কোনও লোকের দুটোর বেশী সন্তান থাকবে না—

গোপাল। ব্রহ্মচর্য চালাতে চাও নাকি?

সিদ্ধিনাথ। পুলিশ বাড়ি বাড়ি খানাতল্লাশ করে বাড়তি ছেলেমেয়ে কেড়ে নেবে, যেমন মাঝে মাঝে রাস্তা থেকে বেওয়ারিস কুকুর ধরে নিয়ে যায়। তার পরে লিথাল ভ্যানে—

গোপাল। মহাভারত! তোমার যদি ছেলেপিলে থাকত তবে এমন বীভৎস কথা মুখে আনতে না।

সিদ্ধিনাথ। রাষ্ট্রের মঙ্গলের কাছে সন্তানস্নেহ অতি

তুচ্ছ। আমি যা বললুম তাই হচ্ছে একমাত্র কার্যকর উপায়। এর ফলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সন্তান নিয়ন্ত্রণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরও কিছু করতে হবে। ডাক্তারদের দমন করা দরকার।

অসিতা। বেওয়ারিস কুকুরের মতন ঠেঙিয়ে মারবেন নাকি ?

সিদ্ধিনাথ। তোমার ভয় নেই। ভবিষ্যতে মেডিক্যাল কলেজে খুব কম ভরতি করলেই চলবে।

অসিতা। ডাক্তারদের দ্বারা জগতের কত উপকার হয় জানেন ? বসন্তের টিকে, কলেরার স্যালাইন, তারপর ইনসুলিন পেনিসিলিন—আরও কত কি। প্রতি বৎসরে কত লোকের প্রাণরক্ষা হচ্ছে খবর রাখেন ?

সিদ্ধিনাথ। ও, তুমি তোমার বরের কাছে এইসব শিখেছ বুঝি ? প্রাণরক্ষা করে কৃতার্থ করেছেন ! কতকগুলো ক্ষীণ-জীবী লোক, রোগের সঙ্গে লড়বার যাদের স্বাভাবিক শক্তি নেই, তাদের প্রাণরক্ষায় সমাজের লাভ কি ? বিস্তর টাকা খরচ করে ডিসপেপসিয়া ডায়াবিটিস ব্লাডপ্রেশার থ্রম্বোসিস আর প্রস্টেট রোগগ্রস্ত অকর্মণ্য লোকেদের বাঁচিয়ে রাখলে দেশের কোন্ উপকার হয় ? যারা স্বাস্থ্যবান পরিশ্রমী কাজের লোক, যারা বীর বিদ্বান প্রজ্ঞাবান কবি কলাবিৎ, কেবল তাদেরই বাঁচবার অধিকার আছে। তাদের সেবা করতে সমর্থ স্ত্রী-লোকেরও বাঁচা দরকার। তা ছাড়া আর সকলেই আগাছার মতন উৎপাটিতব্য।

গোপাল। ওহে রমেশ, এবারে সিধুবাবুর হাঁপানির টান হলে ওষুধ দিও না, বিছানা থেকে উৎপাটিত করে একটা রিকশয় তুলে কেওড়াতলায় ফেলে দিও।

সিদ্ধিনাথ। আমার কথা আলাদা, বেঁচে থাকলে জগতের লাভ। আমার মতন স্পষ্টবাদী জ্ঞানী উপদেষ্টা এদেশে আর নেই।

গোপালবাবুর গৃহিণী নমিতা দেবী একটা ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বয়স বেশী না হলেও এঁর ধাতটি সেকেলে। অসিতা তার দিদিকে আধুনিকী করবার জন্য অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। নমিতা এই সান্ধ্য আড্ডাটির জন্য খুশী নন, বিশেষত সিদ্ধিনাথকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারেন না; বলেন, পাগল না হাতি, শুধু ভিটকিলিমি, কুকথার ধুকড়ি। গতকাল সেকরা নমিতার ফরমাশী নথ দিয়ে গিয়েছিল। তা দেখতে পেয়ে সিদ্ধিনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রিয় মন্তব্য করেছিলেন। তারই শোধ তোলবার জন্য আজ নমিতা যুদ্ধের সাজে দর্শন দিলেন। নাকে নথ, কানে মাকড়ি, গলায় চিক, হাতে অনন্ত আর বালা, কোমরে গোট। কোথা থেকে একটা বাঁকমলও যোগাড় করে পায়ে পরেছেন।

সিদ্ধিনাথ বললেন, আসুন মিসেস মুখুজ্যে।

নমিতা। মিসেস আবার কি? আমি ফিরিঙ্গী হয়ে গেছি নাকি? বউদিদি বলতে মুখে বাধল কেন?

সিদ্ধিনাথ। আর বলা চলবে না, এত দিন ভুল ধারণার

বশে বলেছি। আজ সকালে হিসেব করে দেখলুম গোপাল আমার চাইতে আট দিনের ছোট। যদি অনুমতি দেন তো এখন থেকে বউমা বলতে পারি।

নমিতা। বেশ, তাই না হয় বলবেন।

সিদ্ধিনাথ। বউমা, একটু সামনে দাঁড়াও তো।

নমিতা কোমরে হাত দিয়ে বীরাঙ্গনার মতন সগর্বে দাঁড়ালেন। সিদ্ধিনাথ একমিনিট নিরীক্ষণ করে চোখ বুজলেন। নমিতা বললেন, চোখ ঝলসে গেল নাকি?

সিদ্ধিনাথ। উঁহু, আমি এখন ধ্যানস্থ। বিশ হাজার বৎসর পূর্বের ব্যাপার মানসনেত্রে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ তখন বন্য, গুহায় বাস করে, পাথর আর হাড়ের অস্ত্র দিয়ে শিকার করে। জনসংখ্যা খুব কম, গৃহিণী সহজে জোটে না, জবরদস্তি করে ধরে আনতে হয়। দেখছি—একটা ষণ্ডা লেংটা পুরুষ, আমাদের গোপালের সঙ্গে একটু আদল আছে, কিন্তু মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, মাথায় জটা পড়া চুল, হাতে একটা হাড়ের ডাণ্ডা। সে বউ খুঁজতে বেরিয়েছে। নদীর ধারে একটা মেয়ে গুগলি কুড়চ্ছে, এই বউমার সঙ্গে একটু মিল আছে। পুরুষটা কোনও প্রেমের কথা বললে না, উপহার দিলে না, খোশামোদও করলে না, এসেই ধাঁই করে এক ঘা লাগালে। মেয়েটা মুখ থুবড়ে পড়ল। কপাল ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তার পর তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে লোকটা নিজের আস্তানায় এল এবং নাকে বেতের আংটা পরিয়ে তাতে দড়ি লাগিয়ে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে, যেমন বলদকে বাঁধা হয়। তবু মেয়েটা

পালাবার চেষ্টা করছে দেখে তার পায়ের পাতা চিরে রক্তপাত করলে, দুকান ফুঁড়ে কড়া পরিয়ে দিলে, গলায় হাতে কোমরে আর পায়ে চামড়ার বেড়ি লাগিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেললে। এরকম আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের পর ক্রমে ক্রমে মেয়েটা পোষ মানল, স্বামীর ওপর ভালবাসাও হল। অল্প কালের মধ্যে সকল মেয়েরই ধারণা হল যে নির্যাতনের চিহ্নই হচ্ছে অলংকার আর সৌভাগ্যবতীর লক্ষণ। তার পর হাজার হাজার বৎসর কেটে গেল, ঘরে বউ আনা সহজ হল, সোনা রুপোর গহনার চলন হল, কিন্তু প্রসাধনের রীতি আর গহনার ছাঁদে আদিম বর্বরতার ছাপ রয়ে গেল। সেকালে যা কপালের রক্ত ছিল তা হল সিঁদুর, পায়ের রক্ত হল আলতা। পূর্বে যা বউ বাঁধবার আংটা কড়া আর বেড়ি ছিল, পরে তা নথ মাকড়ি হার বালা গোট আর মলে পরিবর্তিত হল। সংস্কৃতে 'নথ'-এর একটি অর্থ বলদের নাকের দড়ি। তা থেকেই নথ আর নথি শব্দ হয়েছে। আজকালকার যা শৌখিন গহনা তাতেও বর্বর যুগের ছাপ আছে। বউমা, জন্মান্তরের ইতিহাস শুনে চটে গেলে নাকি? তোমার বাপ মা নিশ্চয় সব জানতেন, তাই সার্থক নাম রেখেছেন নমিতা, অর্থাৎ যাকে নোয়ানো হয়েছে।

নমিতা বললেন, আপনার বাপ মাও সার্থক নাম রেখেছিলেন। সিদ্ধিনাথের বদলে গাঁজানাথ হলে আরও ঠিক হত। এখানে যা সব বললেন বাড়ি গিয়ে গিন্নীর কাছে বলুন না, মজা টের পাবেন। এই বলে নমিতা চলে গেলেন।

গোপালবাবু বললেন, ওহে সিদ্ধিনাথ, বক্তৃতার চোটে আমার গিন্নীকে তো ঘর থেকে তাড়ালে, এইবার শালীটিকে একটা লেকচার দাও, ছাত্রী বলে দয়া করো না।

সিদ্ধিনাথ অসিতার দিকে চেয়ে বললেন, হাত দুটো অমন করে ঘোরাচ্ছ কেন?

অসিতা। ঘোরাচ্ছি আবার কোথা। দেখছেন না, একটা মফলার বুনছি। আপনারই জন্য।

সিদ্ধিনাথ। কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। হাত সুড়-সুড় করছে বলেই বুনছ, আমাকে দেবে সে একটা উপলক্ষ্য মাত্র। লেস-পশম বোনা, চরকা কাটা, মালা জপা, বাঁয়া তবলায় চাঁটি লাগানো, গল্প কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, ইও ইও ঘোরানো—এসবের কারণ একই। দরকারী জিনিস তৈরী করছি, দেশের মঙ্গল করছি, ভগবানের নাম নিচ্ছি, কলা চর্চা করছি, সাহিত্য রচনা করছি—এসব ছুতো মাত্র, আসল কারণ হাত সুড়সুড় করছে। এই সমস্ত কাজের মধ্যে ইও ইও ঘোরানোই নির্দোষ। কোনও ছল নেই, শুধুই খেলা।

পাশের ঘর থেকে নমিতা বললেন, মফলারটা খবরদার ওঁকে দিস নি অসিতা, বিশ্বনিন্দুক নিমকহারাম লোক।

সিদ্ধিনাথ। আমার চেয়ে যোগ্য পাত্র পাবে কোথা। আমার যদি ঠাণ্ডা না লাগে, হাঁপানি যদি না বাড়ে, তবে সকল লোকেরই লাভ। অসিতাও এই ভেবে কৃতার্থ হবে যে একজন অসাধারণ গুণী লোকের জন্যই সে মফলার বুনেছে।

গোপাল। ওসব বাজে কথা রাখ। নমিতাকে দেখে তো পুরাকালের ইতিহাস আবিষ্কার করে ফেললে। এখন অসিতাকে দেখে কি মনে হয় বল।

সিদ্ধিনাথ নিজের মনে বলে যেতে লাগলেন, হাজার হাজার বৎসরেও মেয়েরা সাজাতে শিখলো না, কেবল ফ্যাশনের অন্ধ নকল। ঠোঁটে রং দেওয়ার ফ্যাশনটাই ধর। যারা চম্পকগৌরী অল্পবয়সী তাদেরই বিম্বাধর মানায়। সাদা বা কালোকে বা বুড়ীকে মানায় না। আজ বিকেলে চৌরঙ্গী রোডে দুটি অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি। একজন বুড়ী মেম, চুল পেকে শণের নুড়ি হয়ে গেছে, গাল তুবড়ে চামড়া কুঁচকে গেছে, তবু ঠোঁটে রগরগে লাল রং লাগিয়েছে। দেখাচ্ছে যেন তাড়কা রাক্ষসী, সদ্য ঋষি খেয়েছে। আর একজন বাঙালী যুবতী, বেশ মোটা, অসিতার চাইতেও কালো, সেও ঠোঁটে লাল রং দিয়েছে।

অসিতা। কেমন দেখাচ্ছে?

সিদ্ধিনাথ। যেন ভাল্লুকে রাঙা আলু খাচ্ছে।

অসিতা। সার, আমি কখনও ঠোঁটে রং লাগাই না।

সিদ্ধিনাথ। তোমার বুদ্ধি আছে, আমার ছাত্রী তো। কালো মেয়ের যদি অধরচর্চা করবার শখ হয় তবে ঠোঁটে সোনালী তবক এঁটে দিলেই পারে, দামী পানের খিলির ওপর যা থাকে।

অসিতা। কী ভয়ানক!

সিদ্ধিনাথ। ভয়ানক কেন মা? কালীর যদি সোনার চোখ

আর সোনার জিব মানায় তবে কালো মেয়ের সোনালী ঠোঁটে নিশ্চয় মানাবে। তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার।

অসিতা। কি যে বলেন আপনি!

সিদ্ধিনাথ। অর্থাৎ নতুন ফ্যাশন চালাবার সাহস তোমার নেই। কিন্তু সিনেমার অমুকা দেবী বা অমুক মন্ত্রীর কন্যা যদি ঠোঁটে সোনালী তবক আঁটে তবে তোমরাও আঁটবে। আচ্ছা, ডাক্তার বাবাজী, তুমি এই কালো মেয়েটাকে বিয়ে করলে কেন?

রমেশ তার লজ্জা দমন করে বললে, কালো তো নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

সিদ্ধিনাথ। ডাক্তার, তুমি চশমা বদলাও। তোমার বউ মোটেই উজ্জ্বল নয়, দস্তুর মতন কালো। কালোকেই লোকে আদর করে শ্যামবর্ণ বলে। তবে হাঁ, তেল মেখে চুকচুকে হলে উজ্জ্বল বলা যেতে পারে।

অসিতা। জানেন, একটি খুব ফরসা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ওঁর সম্বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু তাকে ছেড়ে আমাকেই পছন্দ করলেন।

সিদ্ধিনাথ। শুনে খুশী হলুম, ডাক্তারের আর্টিষ্টিক বুদ্ধি আছে। গৌর বর্ণের ওপর লোকের ঝোঁক একটা মস্ত কুসংস্কার, স্নবারিও বটে। লোকে কি শুধু সাদা কুকুর সাদা গরু সাদা ঘোড়া পোষে? মারবেলের মূর্তির চাইতে কষ্টি পাথর আর ব্রঞ্জের মূর্তির আদর বেশী কেন? প্রাচ্যদেশবাসী খুব ফরসা হলে কুশ্রী দেখায়, গায়ের রং আর কালো চুলের

কনট্রাস্ট দৃষ্টিকটু হয়। তার চাইতে কুচকুচে কালো বরং ভাল, যদিও চোখ আর দাঁত বেশী প্রকট হয়। আমাদের অসিতা হচ্ছে কপিলা গাইএর মতন সুন্দরী। গায়ে আরসোলা বসলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডেয়ে পিঁপড়ে বসলে বোঝা যায়।

গোপাল। অসিতার ভাগ্য ভাল, অল্পেই রেহাই পেয়েছে, আবার সুন্দরী সার্টিফিকেট আদায় করেছে।

দূর থেকে একটা কাঁসির খ্যানখেনে আওয়াজ এল। সিদ্ধিনাথ চমকে উঠলেন। নমিতা ঘরে এসে বললেন, শুনতে পাচ্ছেন না? যান যান দৌড়ে যান, নইলে গিন্নী আপনার দফা সারবে।

সিদ্ধিনাথের পত্নী রান্না হয়ে গেলেই স্বামীকে ডাকবার জন্য একটা ভাঙ্গা কাঁসি বাজান। সিদ্ধিনাথ তাঁর মুখরা গৃহিণীকে ভয় করেন। বিনা বাক্যব্যয়ে হনহন করে বাড়ির দিকে চললেন।

১৩৫৭

চিরঞ্জীব

পূজোর ছুটিতে দুই বন্ধু হরিহর বসু আর তারক গুপ্ত পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছেন। দিল্লি মেল ছাড়বার দেড় ঘণ্টা আগে তাঁরা হাওড়া স্টেশনে এলেন এবং প্লাটফর্মে গাড়ি লাগতেই একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠে পড়লেন। তাঁদের সীট আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল।

হরিহরবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানা পেতে গট হয়ে বসে পড়লেন, দেখ তারক, যে কদিন কলকাতার বাইরে থাকব সে কদিন বাঙালীর সঙ্গে মোটেই মিশব না। মেশবার দরকারও হবে না, কারণ দিল্লিতে আমরা লালা গজাননজীর বাড়িতে উঠেছি। আগরাতে তাঁর গদি আছে, সেখানেও আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। অতি ভাল লোক গজাননজী।

তারকবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, লোক তো ভাল, কিন্তু তাঁর বাড়িতে নিরামিষ খেতে হবে।

হরিহরবাবু বললেন, ওই তো বাঙালীর মহা দোষ, মাছের জন্যে বেরালের মতন ছোঁকছোঁক করে। তুমি আবার বাঙাল, আরও লোভী।

—আচ্ছা বাপু, পনর দিন না হয় বিধবার মতন থাকা যাবে। কিন্তু তুমিও তো প্রচণ্ড গোস্তখোর।

—ক্রমশ মাছ মাংস ত্যাগ করছি। নিখিল ভারতের ভদ্র-শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের সাজাত্য হওয়া দরকার।

—সাজাত্য আপনিই হচ্ছে, লালাজী শেঠজী চোবেজী সবাই মুরগি খেতে শিখছেন। মহামতি গোখলে ঠিকই বলে গেছেন—What Bengal thinks today India thinks tomorrow। বাঙালীর আর কষ্ট করে সাত্ত্বিক হবার দরকার নেই।

—খুব দরকার আছে। উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র অন্ধ্র তামিলনাড প্রভৃতি রাজ্যের উচ্চ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের সর্বাঙ্গীণ মিলন হওয়া দরকার। খাদ্য পরিচ্ছদ আর ভাষা বদলাতে হবে, নইলে মচ্ছি-চাওর-খোর বংগালী অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় ঠিক বলেছেন—বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের পূর্বমর্যাদা স্মরণ করে পূর্বসম্বন্ধ পুনস্থাপন করতে হবে।

—পূর্বসম্বন্ধটা কিরকম? আমরা সবাই আর্য-খোট্টা এই সম্বন্ধ?

—তার চাইতে নিকটতর। আদিশূরের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন কায়স্থ বাংলা দেশে এসেছিলেন, তাঁদের নেতার নাম দশরথ বসু। তিনি আমার ছাব্বিশতম পূর্বপুরুষ। আসলে আমি বাঙালী নই, কনৌজ লালা কায়েত। তুমিও বাঙালী নও।

—বল কি হে!

—তুমি হচ্ছ কর্ণাটী ব্রহ্মক্ষত্রিয়, বল্লালসেনের স্বজাতি। ইতিহাস পড়ে দেখো।

—আমি তো জানতুম আমি চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের জ্ঞাতি। তোমাদের কথা শুনেছি বটে, আদিশূর কনৌজ থেকে পাঁচ-জন বেদজ্ঞ আচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, তাঁদের তল্পিদার হয়ে পাঁচ জন কায়স্থ এসেছিল।

—ভুল শুনেছ। আদিশূর রাজ্যশাসনের জন্য পাঁচ জন উচ্চবংশীয় ক্ষত্রকায়স্থ আনিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পাঁচটি পাচক ব্রাহ্মণ এসেছিল।

হরিহরবাবু তাঁর ঘড়িতে দেখলেন গাড়ি ছাড়তে আর পনর মিনিট দেরি আছে। তাঁর ব্যাগ খুলে দুটি খদ্দরের টুপি বার করলেন। একটি নিজে পরলেন, আর একটি তারকবাবুকে দিয়ে বললেন, নাও, মাথায় দাও।

তারকবাবু বললেন, টুপি পরব কেন, শুধু মাথা গরম করা। এই তো তুমি বললে যে আমি কর্ণাটী, অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রদেশের লোক। আমরা টুপি পরি না, তার সাক্ষী রাজাজী। বরঞ্চ কাছার একটা খুঁট খুলে রাখছি।

গাড়িতে হুড়মুড় করে লোক উঠতে লাগল। হরিহরবাবুদের কামরা ভরে গেল, বাঙালী বিহারী উত্তরপ্রদেশী মারোয়াড়ী গুজরাটী প্রভৃতি নানা জাতের লোক উঠে বেঞ্চিতে ঠাসাঠাসি করে বসে পড়ল। একটি বাঙালী যুবক একজন স্থবিরের হাত ধরে তাঁকে এক কোণে বসিয়ে দিয়ে বললে,

হালদার মশায়, আপনাকে এখন একটু কষ্ট সইতে হবে। ঘণ্টা তিন চার পরেই লোক কমে যাবে, তখন আপনার বিছানা পেতে দেব।

বৃদ্ধ হালদার মশায় বললেন, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না শরৎ। বয়স হলেও তোমার চাইতে শক্ত আছি। দাঁত নেই, কিন্তু এখনও একটি আস্ত ইলিশ মাছ হজম করতে পারি।

তারকবাবু বললেন, বাঃ আপনি মহাপুরুষ। বড্ড ভিড় নইলে আপনার পায়ের ধুলো নিতুম হালদার মশায়।

হালদার খুশী হয়ে বললেন, তবে বলি শোন। মুঙ্গের জেলায় খরকপুরে থাকতে দু বেলায় একটি আস্ত পাঁঠা সাবাড় করতুম। চার আনায় একটি নধর বকড়ি, আবার তার চামড়া বেচলে পুরোপুরি চার আনাই ফিরে আসত। একবার একটি সিকি খরচ করলে ক্রমান্বয়ে পাঁঠার পর পাঁঠা মুফতে পাওয়া যেত। ভারী লোভ হচ্ছে, নয়? এখন আর সেদিন নেই রে দাদা। ষাট বৎসর আগেকার কথা।

গার্ডের বাঁশি ফুর্‌র্ করে বেজে উঠল। একজন প্রকাণ্ড পুরুষ দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন। হরিহরবাবু বললেন, আর জায়গা নেহি হ্যায়, দুসরা কামরায় যাইয়ে।

গাড়ি চলতে লাগল। আগন্তুকের বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু, কালবৈশাখীর মেঘের মতন গায়ের রং, বাবরি চুল, গাল পর্যন্ত জুলফি, মোটা গোঁফের নীচে পুরু ঠোঁট। পরনে মিহি ধুতি, কাছার এক কোণ ঝুলছে। গায়ে লম্বা রেশমি কোট, তার উপর ভাঁজ করা আজানুলম্বিত

জরিপাড় উড়ুনি। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা; দুই কানে হীরার ফুল, আঙুলে অনেকগুলি নীলা চুনি পান্নার আংটি, পায়ে পনর নম্বর চপ্পল।

ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে আগন্তুক পরিষ্কার বাংলায় হরিহরবাবুকে বললেন, ঘাবড়াবেন না মশায়, আমি শুধু দাঁড়িয়ে থাকব। পান খেয়ে পিক ফেলব না, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ব না, আশ্চর্য মাজন বেচব না। বন্যা ভূমিকম্পের চাঁদা চাইব না, সর্বহারার গানও গাইব না। যদি পরে ভিড় কমে তবে একটু বসবার জায়গা করে নেব। যদি অনুমতি দেন তবে আলাপ করে আপনাদের খুশী করবার চেষ্টা করব।

শরৎ নামক ছেলেটি বললে, কতক্ষণ কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, আপনি আমার পাশে বসুন। আগন্তুক কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার করে বসে পড়লেন।

হালদার মশায় বললেন, মহাশয়ের নামটি কি? নিবাস কোথায়? কি করা হয়? কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

আগন্তুক উত্তর দিলেন, আমার নাম লংকুস্বামী কর্বুরঙ্গ রেড্ডি। আদি নিবাস ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াই। কিছু করি না, মহাদেব আর রামচন্দ্রের কৃপায় আমার কোনও অভাব নেই। এখন আসানসোলে শ্বশুরের কাছে যাচ্ছি, কাল অযোধ্যাপুরী রওনা হব, নবরাত্রি উৎসব দেখতে।

হরিহরবাবু বললেন, আপনি রেড্ডি? ক্ষত্রিয়?

—ব্রাহ্মণও বটি ক্ষত্রিয়ও বটি।

—ও, আপনি ব্রহ্মক্ষত্রিয়, আমাদের এই তারক গুপ্তর স্বজাতি ?

তা বলতে পারি না।

হরিহরবাবু চিন্তিত হয়ে বললেন, তবেই তো সমস্যায় ফেললেন মশায়। আপনি শর্মা ,না বর্মা, না দাশ তালব্য-শ, না দাস দন্ত্য-স ?

—আমি শর্মা-বর্মা-দাষ, দ-এ আকার মূর্ধন্য ষ। আমি জাতিতে মূর্ধাভিষিক্ত। পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা রক্ষঃক্ষত্রিয় রাজকন্যা। রেড্ডি আমার আসল উপাধি নয়, শুনতে মিষ্ট বলে নামের শেষে যোগ করি।

হালদার মশায় বললেন, আহা, কেন ভদ্রলোককে জেরা করে বিব্রত কর, দেখতেই তো পাচ্ছ ইনি মাদ্রাজী। আরও পরিচয়ের দরকার কি। আপনি তো খাসা বাংলা বলেন মশায়। শিখলেন কোথায় ?

লংকুস্বামী হেসে বললেন, আমার বর্তমানা পত্নী আট বৎসর শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাঁর কাছেই বাংলা শিখেছি।

হরিহরবাবু বললেন, বর্তমানা পত্নী ?

—আজ্ঞে হাঁ। পত্নীদেরও ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান আছে।

হালদার মশায় বললেন, এই সোজা কথাটা বুঝলে না ? ইনি অনেক বার সংসার করেছেন। এই আমার মতন আর কি। চার বার বিবাহ করেছি, কলাগাছ নিয়ে পাঁচ। কিন্তু এখন গৃহ শূন্য। আবার বিবাহ করবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু

শেষ পক্ষের সম্বন্ধী এই শরৎ শালার জন্যে তা হচ্ছে না, কেবলই ভাংচি দেয়।

লংকুস্বামী বললেন, মহাশয়ের বয়স কত হয়েছে ?

—চার কুড়ি পুরতে এখনও ঢের বাকী।

শরৎ বলে উঠল, মিথ্যে বলবেন না হালদার মশায়, সেই কবে আশি পেরিয়েছেন !

—তুই চুপ কর ছোঁড়া। বুঝলেন লংকুবাবু, বয়স যতই হোক খুব শক্ত আছি। এখনও একটি আস্ত ইলিশ হজম করতে পারি।

লংকুস্বামী বললেন, তবে আর ভাবনা কি। আপনি তো বালক বললেই হয়, একশ বার বিবাহ করতে পারেন।

—হেঁ হেঁ। বালক নই, তবে জোয়ান বলতে পারেন। মহাশয় ক বার সংসার করেছেন ?

লংকুস্বামী পকেট থেকে একটি নোটবুক বার করে দেখে বললেন, এখন উনবিংশত্যধিক-শততম সংসার চলছে।

—তার মানে ?

—অর্থাৎ এখন পর্যন্ত এক শ উনিশ বার বিবাহ করেছি।

হালদার মশায় চোখ কপালে তুলে বললেন, প্রত্যেক বারে দশ বিশ গণ্ডা বিবাহ করেছিলেন নাকি ?

—না না, বহুবিবাহে আমার ঘোর আপত্তি, যদিও আমার বড়-দা আর মেজ-দার অনেক পত্নী ছিলেন। আমি চিরকালই একনিষ্ঠ, এক-একটি পত্নী গত হলে আবার একটির পাণি-গ্রহণ করেছি।

একজন গুজরাটী যাত্রী সশব্দে হেসে বললেন, বুঝছেন না হালদার মোসা, ইনি আপনাকে বিয়া পাগলা বূঢ়া ঠহ্‌রেছেন, তাই আপনার পয়ের খিঁচছেন, যাকে বলে লেগ পুলিং।

লংকুস্বামী তাঁর বৃহৎ জিহ্বা দংশন করে বললেন, রাম রাম, আমি ঠাট্টা করছি না, সত্য কথাই বলছি।

গাড়ি বর্ধমানে পৌঁছল, অনেক যাত্রী নেমে গেল। লংকুস্বামী বললেন, এখন একটু জায়গা হয়েছে, আপনাদের যদি অসুবিধা না হয় তবে আমার স্ত্রীকে মহিলা-কামরা থেকে নিয়ে আসি। সেখানে বড় ভিড়, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। ঘণ্টা দুই পরেই আমরা আসানসোলে নেমে যাব।

শরৎ বললে, কোনও অসুবিধা হবে না, আপনি তাঁকে নিয়ে আসুন।

লংকুস্বামী তাঁর পত্নীকে নিয়ে এলেন। বয়স আন্দাজ পঁচিশ, সুশ্রী তন্বী শ্যামা, কাছা দিয়ে শাড়ি পরা, মাথা খোলা, দুই কানে আর নাকের দুই পাশে হীরে ঝক্‌মক্ করছে। লংকুস্বামী পরিচয় দিলেন, এই ইনিই আমার এক শ উনিশ নম্বরের স্ত্রী, এঁর নাম সুরাম্মা বাই। সুরাম্মা স্মিতমুখে সকলের উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

হালদার মশায় চুলবুল করছেন আর তাঁর ঠোঁট বার বার নড়ছে দেখে লংকুস্বামী বললেন, আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান কি? স্বচ্ছন্দে বলুন, আমার স্ত্রীর জন্য কোনও দ্বিধা করবেন না।

হালদার মশায় বললেন, এক শ উনিশ বার বিবাহ করা চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার বয়স কত হবে লংকুবাবু।

—আপনি আন্দাজ করুন না।

—আমার চাইতে কম। এই পঞ্চাশের মধ্যে আর কি।

—হল না, আরও উঠুন।

—ষাট?

—আরও, আরও!

—সত্তর? আশি?

তারকবাবু হেসে বললেন, আপনার কাজ নয় হালদার মশায়। নিলামের দর চড়ানো আমার অভ্যাস আছে। লংকুস্বামীজী আপনার বয়স এক শ।

—হল না, আরও উঠুন।

—পাঁচ শ? হাজার? দু হাজার?

—আরও, আরও।

—চার হাজার? পাঁচ হাজার?

লংকুস্বামী বললেন, এইবার কাছাকাছি এসেছেন। সুরাম্মা তুমি তো সেদিন হিসেব করেছিলে তোমার চাইতে আমি ক বছরের বড়। তুমিই বাবুমশায়দের শুনিয়ে দাও আমার বয়স কত।

সুরাম্মা সহাস্যে মৃদুস্বরে বললেন, পাঁচ হাজার পাঁচ শ পঞ্চান্ন।

হালদার মশায় হাঁ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। হরিহরবাবু হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলেন, স্বপ্ন দেখছি, না জেগে

আছি? অন্য যাত্রীরা নির্বাক হয়ে রইল, কেউ কেউ বোকার মতন হাসতে লাগল।

তারকবাবু বললেন, ক বছর অন্তর বিবাহ করেছিলেন মশায়?

লংকুস্বামী আবার তাঁর নোটবুক দেখে বললেন, গড়ে ছেচল্লিশ বৎসর অন্তর। আমার স্ত্রীদের আয়ু তো আমার মতন ছিল না, সকলেই যথাকালে গত হয়েছিলেন। অষ্টম হেনরির মতন আমি স্ত্রীবধ করি নি, স্ত্রীত্যাগও করি নি। আমার সকল স্ত্রীই সতীলক্ষ্মী।

হালদার মশায় ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলেন, সন্তানাদি কতগুলি?

—সুরাম্মার এখনও কিছু হয়নি। আমার পূর্ব পূর্ব পক্ষের সন্তানদের হিসেব রাখি নি, রাখা সাধ্যও নয়। বিস্তর জন্মেছিল, বিস্তার মরে গেছে, তবু জীবিত বংশধরদের সংখ্যা এখন কয়েক লাখ হবে।

তারকবাবু বললেন, যত রেড্ডি পিল্লে মেনন নাইডু নায়ার চেট্টি আয়ার আয়েঙ্গার সবাই আপনার বংশধর নাকি?

—শুধু ওরা কেন। চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ঘোষ বোস সেন আছে, সিং কাপুর চোপরা মেটা দেশাই আছে, শেখ সৈয়দ আছে, হোর লাভাল কুইসলিং আছে, চ্যাং কিমাগুসা ভডকুইস্কি প্রভৃতিও আছে। সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরে মানুষের জাতিপত পরিবর্তন অনেক হয়।

—আপনি তা হ'লে মহেঞ্জোদাড়ো হারাপ্পা যুগের লোক।

—তা বলতে পারেন। ওইসব দেশবাসীর সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষদের কুটুম্বিতা ছিল। আমার বৃদ্ধপ্রমাতামহীর নাম সালকটংকটা, তিনি হারাপ্পার রাজবংশের কন্যা ছিলেন।

হরিহরবাবু এতক্ষণে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, উঃ, দীর্ঘ জীবনে আপনার বিস্তর স্বজনবিয়োগ হয়েছে, কতই না শোক পেয়েছেন!

—শোক পাব কেন। কৃষকের আয়ু ধানগাছের চাইতে বেশী। ধানগাছ শস্য দিয়ে মরে যায়, তার জন্য কৃষক কিছুমাত্র শোক করে না, আবার বীজ ছড়ায়।

হরিহর বললেন, ওঃ, সাড়ে পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস আপনার চোখের সামনে ঘটে গেছে!

—হাঁ। পলাসীর যুদ্ধ, পৃথ্বীরাজের পরাজয়, হর্ষ-বর্ধনের দিগ্‌বিজয়, আলেকজাণ্ডারের আগমন, বুদ্ধদেবের জন্ম, কুরুক্ষেত্র -যুদ্ধ সবই আমি দেখেছি।

—রাম-রাবণের যুদ্ধও দেখেছেন?

লংকুস্বামী গম্ভীর হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তাও দেখতে হয়েছে। শুধু দেখা নয়, লড়তেও হয়েছে। ও কথা আর তুলবেন না।

হরিহরবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত জোড় করে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে প্রভু।

'গুজরাটী ভদ্রলোকটি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দুই উরুতে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে বললেন, ও হো হো হো! আমি বুঝে লিয়েছি, আপনি হচ্ছেন বিভীখন মহারাজ, রাম-

চন্দ্রের বরে চিরঞ্জীব হয়েছেন। এখন একটি বাত বলছি শুনেন। আমার নাম শুনে থাকবেন, লগনচাঁদ বজাজ, নয়নসুখ ফিলিম কম্পনির মালিক। নয়া ফিলিম বানাচ্ছি— রাবণ-সন্‌হার। রোশেনারা পকৌড়িলাল সাগরবালা এঁরা সব নামছেন। আপনারা আমার কম্পনিতে জইন করুন। খুদ আমি রামচন্দ্রের পার্ট লিব। আপনি বড়দাদা রাবণের পার্ট লিবেন, সুরাম্মা বাই সীতার পার্ট লিবেন। হজার টাকা করে মহীনা দিব। এই আমার কার্ড। বিচার করে দেখবেন, রাজী হন তো এক হপ্তার অন্দর এই ঠিকানায় আমাকে তার ভেজবেন। আচ্ছা ?

লংকুস্বামী একবার কটমট করে তাকালেন। লগনচাঁদ থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর হাত থেকে কার্ডখানা খসে পড়ে গেল।

এই সময়ে গাড়ি আসানসোলে এসে থামল। সস্ত্রীক লংকুস্বামী কোনও কথা না বলে যুক্তকরে বিদায় নিলেন এবং বাঘের মতন নিঃশব্দে পা ফেলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন।

১৩৫৭